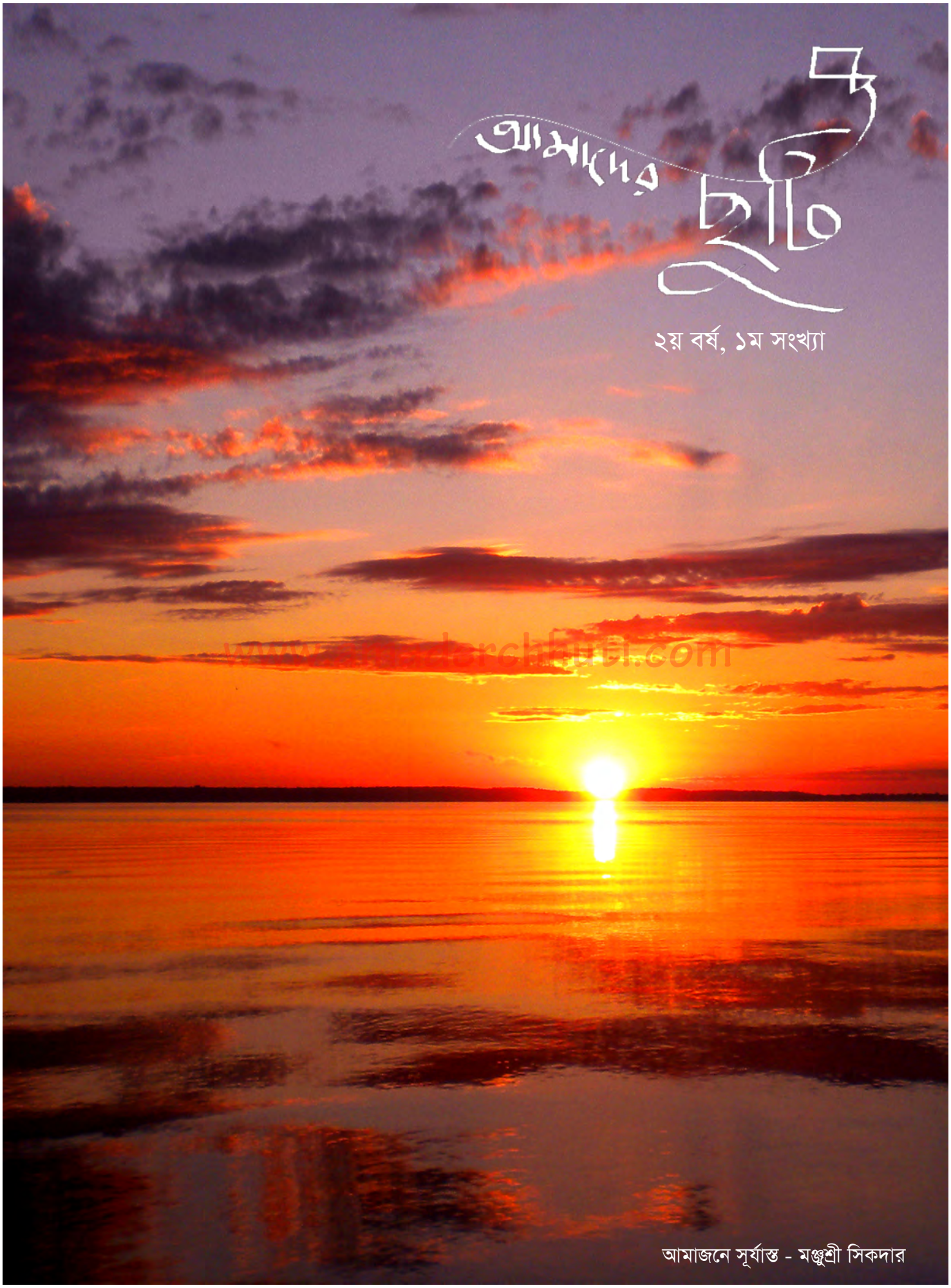
আমাদের ছুটি
২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা
আমাজনে সূর্যাস্ত - মঞ্জুশ্রী সিকদার

☐ ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা - বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯ ☐

এই সংখ্যায়-

'আমি যখন ট্রেকটা শুরু করি তখন এটাকেই যে ট্রেকিং বলে... হেঁটে যেতে হয়... সেটাই জানতাম না।' ১৯৭২ সালে পায়ে হেঁটে প্রথম মানেভঞ্জন। সেই শুরু। চল্লিশ বছরের অনিঃশেষ পথ হাঁটার দীর্ঘকথনে পশ্চিমবঙ্গের ট্রেকিং দুনিয়ার প্রাণপুরুষ রতনলাল বিশ্বাস

www.amaderchhuti.com

☐ আরশিনগর ☐

দু'চাকায় বাংলা - তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ যাত্রার ডায়েরি- মহম্মদ মহিউদ্দিন

হেমন্তের ধানে ভরা মাঠ পেরিয়ে সবুজ পাহাড়ের কোলঘেঁষে মেরিন ড্রাইভ ধরে সমুদ্র -পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলা। বাংলার মায়াভরা পথে উত্তর থেকে দক্ষিণে ৬ দিনে ৯৯৯ কিলোমিটার সাইকেল ভ্রমণ।

☐ সব পেয়েছির দেশ ☐

তরঙ্গ ছুঁয়ে – মানব চক্রবর্তী

সাগরের হাতছানি, ঢেউয়ের গর্জন, অজানা সৈকত, সুনামির ধ্বংসচ্ছবি, ভেলাংগিনি চার্চের অপরূপ ভাস্কর্য আর অচেনা মানুষের সুখ-দুঃখের কাহিনির ভিতর দিয়ে তামিলনাড়ুর সমুদ্রতীর ধরে এক অনন্য পদযাত্রা।

ভয়ঙ্কর সুন্দরের টানে – দেবাশিস বিশ্বাস

একের পর এক পাহাড়ি গ্রাম, ধাপ চাষের ক্ষেত, পাহাড়িয়া ফুল, পাখি আর প্রজাপতির অপরূপ ভিজ্যুয়াল। যেন শিল্পীর আঁকা ছবিতে একেকটা তুলির টান, আর তার মধ্য দিয়েই ছবির একটা চরিত্র হয়ে এগিয়ে চলা অজানার আকর্ষণে। পৌঁছনো সেই তুষাররাজ্যে যেখানে সুন্দর আর ভয়ঙ্কর একই দৃশ্যের এপিঠ-ওপিঠ - কাঞ্চনজঙ্ঘা - যে অভিযান জন্ম দিল আরেকটি ইতিহাসের।

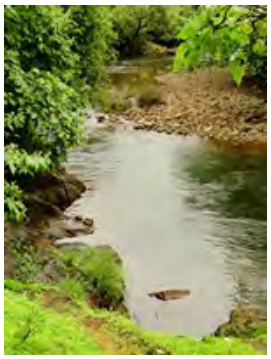

মেঘমুলুক – সুচেতনা মুখোপাধ্যায় চক্রবর্তী

পুরাণ, ইতিহাস, অরণ্যভূমি, পাহাড় আর পাঁচ নদীর উৎস ছুঁয়ে মেঘমুলুকের আবছায়াতে ঘুরে দেখা মহাবালেশ্বর – মহারাষ্ট্রের শৈল ঠিকানা।

☐ ভুবনডাঙা ☐

আমাজনের জলে-জঙ্গলে – মঞ্জুশ্রী সিকদার

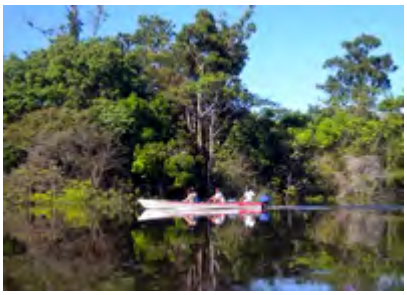

প্রাচীন অরণ্যের নিঝুম আঁধার ঠেলে অজানাকে আবিষ্কারের রোমাঞ্চ – অ্যারিউ নদীতে নৌকাভ্রমণ –ব্ল্যাক রিভারের বুকে সূর্যোদয় - আদিবাসী গ্রামের একটি সকাল – টুকরো টুকরো ছবি গেঁথে আমাজনের অরণ্যভ্রমণকথা।

☐ অন্য ভুবন ☐

যাদব পেয়াং - অরণ্যকে ভালোবেসে একাই গড়ে তুলেছেন আস্ত একটা বনাঞ্চল – আসামের জোরহাটে ব্রহ্মপুত্র নদকে ঘিরে 'মুলাই রিজার্ভ'। অন্যদিকে পশুপাখিদের ভালোবাসেন এমন কিছু মানুষ মিলে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে ফুটপাথের জীবজন্তুদের জন্যই নির্মাণ করেছেন একটা হাসপাতাল -'অ্যানিমাল লিঙ্ক'। আগামীর বাসযোগ্য অন্য ভুবন গড়ে তোলার চেষ্টায় রত মানুষদের কথা দময়ন্তী দাশগুপ্তের কলমে

www.amaderchhuti.com

☐ শেষ পাতা ☐

হঠাৎ দেখা - ডঃ দেবপ্রিয় সেনগুপ্ত

ঘন সবুজ বনের নিস্তব্ধতা চিরে মাঝে মাঝে অচেনা পাখির ডাক, পাতা মাড়িয়ে খসখসে আওয়াজ তুলে হরিণের পালের দৌড়ে যাওয়া – তারপর! অকস্মাৎ বনসবুজের মাঝে তার দেখা -কমলা-হলুদের ওপর ডোরাকাটা রাজেন্দ্রাণীর শরীরে ঝলমল করে রোদ্দুরের আভরণ।

হাউসবোটে একদিন - অদিতি ভট্টাচার্য

আলেপ্পি থেকে কুমারাকোম – নারকেল গাছে ছাওয়া সমুদ্রতীর, ছবির মত গ্রাম, শহর, মাঠ, বৃষ্টিভেজা সবুজ ধান ক্ষেত পেরিয়ে কেরালার ব্যাক ওয়াটারে হাউসবোটে ভ্রমণের এক অনন্য দৃশ্যকল্প।

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বেড়ানোর কথা
আর ছবি নিয়ে
বাংলা
ই-ম্যাগাজিন

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা - বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯

'আমাদের ছুটি'র ১-এ পা

'ভ্রমণ' শব্দটার একটা বিশাল ক্যানভাস আছে যার মধ্যে শুধু বেড়ানো বা ট্রেকিং, মাউন্টেনিয়ারিং নয়, রয়েছে জীব জগৎ, প্রকৃতি, পরিবেশ-ও। আর রয়েছে পৃথিবীর নানান প্রান্তের মানুষ। ভ্রমণ পারে দূরকে কাছে আনতে, অপরিচিত মানুষকে আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে ফেলতে। ভ্রমণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারে একটা অন্য রকম পৃথিবী - যেখানে সব মানুষ হয়ে উঠবে পরস্পরের বন্ধু। একই সম্ভাবনা দেখি আন্তর্জালের দুনিয়াতেও - এখানে গোটা বিশ্ব যেমন নাগালের মধ্যে, তেমনি মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া আর বন্ধুত্বের আবহ গড়ে তোলাও খুবই সহজ। এইসব ভাবনার পাশাপাশি ভালোবাসা আর নতুন কিছু করার ইচ্ছা থেকেই জন্ম নিয়েছিল 'আমাদের ছুটি'। ১৪১৮-র বৈশাখ (ইংরেজি ১৪মে, ২০১১) সংখ্যা দিয়ে শুরু হয়েছিল পথচলা। যখন কেউ প্রশ্ন করেন এতে লাভ কী? উত্তর দিই, কেবল পরিশ্রম, আর অনেকটা ভালোলাগা।

বাংলা একটা ভারি সুন্দর ভাষা, আমাদের মাতৃভাষা-ও। এমন একটা ভাষা যার জন্য দুই দেশের মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু বাংলাভাষায় বেশ কিছু উঁচু মানের সাহিত্যপত্রিকার ওয়েব সাইট থাকলেও ভ্রমণকাহিনি, বেড়ানোর ছবি, তথ্য, বেড়ানোর প্ল্যান, খবর এবং আরও নানাকিছু নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ বাংলা ভ্রমণ ই-পত্রিকা ওয়েবে আর নেই - আমরা সেই অভাবটাই পূরণ করতে চেয়েছি। পৌঁছে দিতে চেয়েছি পাঠকদের কাছে বিনামূল্যে। 'আমাদের ছুটি'-র লেখক-পাঠক-আলোকচিত্রীর গণ্ডিটা বেশিরভাগ ভ্রমণপত্রিকার থেকে অনেকটাই আলাদা। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা পাঠকই এই পত্রিকার লেখক, তাঁরাই আলোকচিত্রী। আমরা চাই আগ্রহী পাঠকদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাঠানো বেড়ানোর কথা আর ছবিতে পত্রিকার পাতা সাজিয়ে তুলতে – লেখক-পাঠকের ব্যবধানটা আবছা করে দিতে।

www.amaderchhuti.com

ওয়েবসাইটে 'আমাদের কথা'য় শুরুতেই বলেছিলাম যে, আমাদের ইচ্ছে দুই বাংলা তথা সারা পৃথিবীর বাংলাভাষী মানুষকে একটা মঞ্চে আনা – যেখানে নানান প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিরা তাঁদের মাতৃভাষাতেই বিনিময় করতে পারবেন নতুন নতুন জায়গা দেখে তাঁদের ভাল লাগার অনুভূতি। হয়তো ভাবনাটা অনেকটাই বড়, কিন্তু ছোট ছোট একেকটা ঘটনায় যখন সেই ভাবনার বাস্তবায়ন হতে দেখি তখন মন ভরে ওঠে। এক ডাকেই কথোপকথনের আড্ডায় এই বাংলার এভারেস্টজয়ী দীপঙ্কর ঘোষ - রাজীব ভট্টাচার্যের সঙ্গে ই-মেলে যোগ দেন বাংলাদেশের এভারেস্টজয়ী মুহিত। আবার এই সূত্রেই গত নভেম্বরের এক সকালে দীপঙ্কর ফোন করে ধন্যবাদ জানান 'আমাদের ছুটি'-কে - মুহিতের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ যাচ্ছেন বলে। আমাদের ডাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের কিছু ভ্রমণপাগল মানুষ ভার নিয়েছেন ওয়েবসাইটের বাংলাদেশ বিভাগটি তথ্যে সাজিয়ে তোলার। সেই কাজ চলছে। 'ছুটির আড্ডা'-য় হাজির থাকছেন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক ঊর্মি রহমান। এগুলোওতো বড় আনন্দ, বড় পাওনা। আরও ভাল লাগে যখন বাঙ্গালোর প্রবাসী সুব্রত চক্রবর্তী 'আমাদের ছুটি'-র গেস্টবুকে লেখেন - প্রবাসে বসে বাংলা পত্রিকাতো বিশেষ হাতে আসেনা তাই এত সুন্দর পত্রিকাটি বাংলা বলেই আরও মন ছুঁয়ে যায়। তখন সত্যিই এত চেষ্টা আর পরিশ্রম সার্থক মনে হয়।

লেখক-পাঠক-আলোকচিত্রী বন্ধুদের বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। 'আমাদের ছুটি'-র জন্মদিনকে মনে রেখে 'ছুটির আড্ডা' বসছে কলকাতায় - পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির জীবনানন্দ সভাঘরে শনিবার, ১২ মে, ২০১২। বেড়ানোর গল্প শুনে আর ছবি দেখে রোজকার ধরাবাঁধা জীবনের ফাঁকে একটা ছুটির সন্ধ্যা কাটিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ রইল সব বন্ধুর কাছে।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

কাঞ্চনজঙ্ঘা - বার্মিওক, সিকিম থেকে
ছবিঃ রত্নদীপ দাশগুপ্ত

কথোপকথন

[ট্রেকিং-এর প্রসঙ্গ এলে যাঁর নাম সকলের আগে মনে আসবেই, তিনি রতনলাল বিশ্বাস। পথচলা শুরু হয়েছিল ১৯৭২ সালে আঠেরো বছর বয়সে - মানেভঞ্জন থেকে। এরপর সিকিম, নেপাল, গাড়োয়াল - কাশ্মীর থেকে অরুণাচল প্রদেশ - হিমালয়ের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বার বার হেঁটেছেন তিনি - চেনা-অচেনা নানান পথে। সমুদ্র সৈকত ধরে পদযাত্রার শুরু ১৯৮২ তে। ভারতের দুই উপকূল ছাড়াও হেঁটেছেন আন্দামান-নিকোবর, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার সৈকতেও। হেঁটেছেন নর্মদা ও কাবেরী নদী উপত্যকার পথে, বোরি ও মেলঘাট অরণ্যে, রাজস্থানের মরুপ্রান্তরে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলি সংগৃহীত হয়েছে পুস্তকাকারে। যার মধ্যে 'লা সো লাদাখ', 'দু'পায়ে দু'কূলে', 'নেপাল থেকে নেপালে', 'ট্রেকিং গাইড' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফটোগ্রাফির জন্য বাংলা তথা জাতীয় স্তরের নানান পুরস্কার এবং লেখালেখির জন্য ভ্রমণ সম্মান, উমাপ্রসাদ জন্ম শতবর্ষ সম্মান ও আরও নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন চিরভ্রামণিক মানুষটি।]

হিমালয়ের যে কোন ট্রেকরুটে গেলে এখন এক বা একাধিক বাঙালি তরুণদলের দেখা পাওয়া যায়ই। ইন্টারনেটে দেখা যায় বিভিন্ন সংস্থাই সবকিছুর ব্যবস্থা করে নিয়ে যাচ্ছে ট্রেকিংয়ে। পশ্চিমবঙ্গে ট্রেকিং-এর এই জনপ্রিয়তার পেছনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে রতনলাল বিশ্বাসের নাম। অথচ ১৯৭২ সালে যখন ট্রেকিংটা আক্ষরিক অর্থে শুরু করেন তখন পাহাড়ে পায়ে হেঁটে চলার এই ব্যাপারটাকে যে ট্রেকিং বলে তাই আদৌ জানতেন না। তারপরে সেই দীর্ঘ পথহাঁটার গল্প চল্লিশ বছর পেরিয়ে আজও অব্যাহত। তবে একা নয়, তাঁর সঙ্গে হাজার বছর ধরে আমরাও পথ হাঁটছি - তাঁর অনবদ্য লেখনী আর অসামান্য সব ছবির ভেতর দিয়ে। তাঁর সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন ছোট্টখাট্টো চেহারার এই সহজসরল মানুষটিকে ভালো না বেসে পারেননি, মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন তাঁর পথচলার কাহিনি, দেখেছেন ছবির পর ছবি। তাঁদের কথায়, রতনদার গল্প আর ছবি বারবার শুনলে আর দেখলেও পুরোনো হয়না। তাঁদের কাছে আরেকবার সেই প্রিয় মানুষটির কথা তুলে ধরতে আর যাঁরা এখনো পরিচিত হননি এই মানুষটির সঙ্গে তাঁদের জন্য 'আমাদের ছুটি'-র এই দীর্ঘ আলাপচারিতা। আমরাও বারবার ফিরে পড়ব আর সমৃদ্ধ হব।

www.amaderchhuti.com

◆ রতনদা, আপনি যখন পাহাড়ে পথ হাঁটা শুরু করেছিলেন তখনো তো পশ্চিমবঙ্গে ট্রেকিং এত জনপ্রিয় ছিল না। সেই সময়ে আপনার মাথায় এটা এল কীভাবে? এর শুরুই বা ঠিক কবে?

□আমি শুরু করেছিলাম সত্তরের দশকে -১৯৭২ সালে। সেইসময়েও এখানে কিন্তু ট্রেকিং ব্যাপারটা বেশ চালু ছিল, তবে এতটা ব্যাপক হয়নি। তবে ট্রেকিং বলতে তখন শুধু পাহাড়ই বোঝাত -মূলতঃ গাড়োয়াল। দু'একজন হয়তো নেপালে বা হিমাচলে গেছেন কিন্তু সেই সংখ্যাটা ছিল হাতে গোনা। পরবর্তী সময়ে এই যে ট্রেকিং মানে অনেককিছু, শুধু গাড়োয়াল নয় বা শুধু হিমালয় নয় -টোটাল স্প্যানটা অনেক বেশি -লাদাখ থেকে নেপাল -কোস্টাল ট্রেকিং, ডেজার্ট ট্রেকিং - এই জনপ্রিয়তার পেছনে কিন্তু আমি একা নই, বেশ কিছু মানুষ আছেন যাঁদের চেষ্টায় ব্যাপারটা এই জায়গায় পৌঁছেছে।

আমার ছেলেবেলা কেটেছে টিটাগড়ে। সেটা ছিল বস্তির লাগোয়া একটা এলাকা - অবাঙালি অধ্যুষিত। সেই পরিবেশে বড় হয়ে আর তার পাশাপাশি আমরা যে আর্থিক স্তরের মানুষ ছিলাম সেইখান থেকে এই ভাবনাগুলো সত্যিই মাথায় আসতে পারে না। তবে বেড়ানোর নেশাটা আমার ছিলই। স্কুল থেকে দু'একবার এক্সকারশনে গেছি মাইথন, দিঘা - তখনই এসবের সূত্রপাত। তারপর হঠাৎ করেই একটা সুযোগ এসে গেল। তখন সবে কলেজে ঢুকেছি - বঙ্গবাসীতে। আমার এক বন্ধুর জামাইবাবু ছিলেন মানেভঞ্জনের বীট অফিসার। উনি আমাদের বললেন, তোমরা বেড়াতে আসবে, চলে এস। তো কীভাবে যাব? তখনতো আর বুঝিনি যে একে ট্রেকিং বলে, এরজন্যে পিঠে ব্যাগ নিতে হয়। উনিই বললেন, এক কাজ কর, পগেয়া পট্টিতে চলে যাও, সেখান থেকে পিট্টু ব্যাগ কিনবে, শীতের জামাকাপড় কিনবে। শীতের জামা বলতে তো আমার সম্বল নিজের ছোট সোয়েটার আর বাবার কোট। গায়ে জড়ানোর জন্য পুরোনো কম্বল। পথে রান্না করে খেতে হবে তাই সঙ্গী হল ফিতেওলা জনতা স্টোভ। এইভাবেই আমার প্রথম পাহাড়ে পায়ে হাঁটার শুরু।

ফিরে এসে আরেক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। কলেজ স্কোয়ারের কাছে রামকান্ত মিস্ত্রি লেনে ওই বন্ধুটিরই দাদার দোকানে আমরা আড্ডা মারতাম। সেখানে টোনিদা বলে এক ভদ্রলোক আসতেন। তিনি খুব বেড়াতেন। আমাদের গল্প শুনে বললেন, আরও অনেক জায়গায় এভাবে যাওয়া যায়। বললাম, কোথায়? উনি বললেন, পিণ্ডারি চলে যাও - কীভাবে যেতে হবে তাও বুঝিয়ে দিলেন। এভাবেই আস্তে আস্তে ট্রেকিং ব্যাপারটার মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

◆ অতীশ দীপঙ্কর যে পথে তিব্বত গিয়েছিলেন সেই রুট ধরে নেপালে আপনি ট্রেকিং করেছেন। সেইসময়তো ওই পথ বন্ধও ছিল। সেই অভিজ্ঞতার কথা একটু বলুন।

□অতীশ দীপঙ্কর এই পথে গিয়েছিলেন সেটা জানি, কিন্তু সেটার থেকেও বড় ব্যাপার হল এটা একটা অন্য মাপের পথ। জায়গাটা হল মুস্তাং ভ্যালি। যদি ছবিগুলো দেখো তাহলে বুঝতে পারবে মুস্তাং ভ্যালি কী অনন্য। হিমালয় বলতে যে ছবিটা আমাদের চোখে ভেসে ওঠে - নীল আকাশ, সাদা বরফের পাহাড়, সবুজ জঙ্গল, নীল নদী, মাঝে মাঝে গ্রাম, বাড়িঘর - সেসবের থেকে একেবারে আলাদা। ডেজার্ট মাউন্টেনের যতরকম ফিচার হয়, যতরকম রঙ হয় মুস্তাং যেন তার একটা অসাধারণ কোলাজ।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে একটা আর্টিকেল বেরিয়েছিল-'মুস্তাং, দ্য লস্ট টিবেটান কিংডম'-ওই লেখাটা এবং তার পরবর্তীকালে অস্ট্রিয়ার পর্বতারোহী হেইনরিখ হারের 'সেভেন ইয়ারস ইন টিবেট', ডেভিস স্নেলগ্রোভের 'হিমালয়ান পিলগ্রিমেজ' ও তিব্বতের ওপর অন্য আরও কিছু বই পড়ে আমার মনে হয়েছিল যে আমাকে ওই ভ্যালিতে যেতেই হবে। তখন আমি খুব নেপাল পাগল ছিলাম। নেপালে একটার পর একটা ট্রেকিং করছি, সব নিষিদ্ধ এলাকাতেই ঢুকেছি। কেবল ওইখানে কিছুতেই যেতে পারছিলাম না। নেপালে আমার চেনা পরিচিত যাঁরা রয়েছেন

তাঁরাও চেষ্টা করছিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। প্রথমবার তো হলই না, দ্বিতীয়বারেও প্রায় ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম। তৃতীয়বারের চেষ্টায় - সেটা বোধহয় ২০০৩, সফল হই। সেই সময় নেপালে মাওবাদীদের সঙ্গে একটা গন্ডগোল চলছিল, পুলিশ-প্রশাসন সবাই ওই নিয়েই ব্যস্ত। সেই ডামাডোলের ফাঁক গলেই ঢুকে পড়েছিলাম মুস্তাং ভ্যালিতে।

স্বামী যোগানন্দ, অপূর্বানন্দ, কাওয়াকাজি এঁদের বইগুলো পড়ার পর সত্যি ওইখানে দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। যেন আমরা পৃথিবীর ছাদে উঠে গেছি - ধু ধু একটা বিশাল প্রান্তর - বিরাট প্রকৃতি - ঘোড়া ছুটিয়ে, ধুলো উড়িয়ে লোকজন যাচ্ছে - একটা অন্যরকম অনুভূতি, ঠিক বলে বোঝান যাবে না - এই পথ দিয়ে কয়েক হাজার বছর ধরে হেঁটে গেছেন অভিযাত্রীর দল।

তবে আজকাল মুস্তাং ভ্যালিতে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলেও আমাদের মতো মানুষের পক্ষে এখন আর ওই খরচ বিয়ার করাই সম্ভব নয়। মাথাপিছু প্রতিদিনের খরচ ৭০ ডলার, তারসঙ্গে প্রতিদিন মাথাপিছু ট্রাভেল এজেন্সির জন্য খরচ ৪২ ডলার। কতজন যেতে পারবে সে নিয়েও কড়াকড়ি রয়েছে। বছরে বোধহয় ১০০০ জনকে যেতে দেয়।

◆ সদ্য চাদর ট্রেক করে এলেন। -৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জমাট নদীখাত ধরে হাঁটা। হিমালয়ের বিভিন্ন কঠিন পাস পেরনোর অভিজ্ঞতার মধ্যে আপনার সবচেয়ে সুন্দর কোনটা মনে হয়েছে? সবথেকে কঠিনই বা কোনটা?

☐ওইভাবে বলাটা শক্ত। একেকটা সিচুয়েশনে সহজ পাসটাই কঠিন হয়ে যায়। তবে টেকনিকালি বলতে গেলে খুব কঠিন পাস নেপালের তাসি লাবচা। এই পাসটাতে প্রচুর ক্যাজুয়ালটি হয়, অনেক লোক মারা যায়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই পাসটি প্রথম অতিক্রম করেন গোপেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৯৫১ সালে হিলারির সঙ্গে তিনি এই পথে গিয়েছিলেন। সেইসময় উনি ছিলেন সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ডাইরেকটর। গোপেন্দ্রনাথই হচ্ছেন প্রথম বাঙালি যিনি পর্বতশীর্ষে ওঠেন, সেটা হল আইল্যান্ড পিক। ওঁর পর ওই পথে বাঙালি আর কেউ যাননি - ভারতীয় হিসেবে প্রথম গিয়েছিলেন হরিশ কাপাডিয়া, ১৯৭৪-এ। সেটার জন্যও দারুণ একটা ক্রেজ ছিল। পথটা খুব কঠিন, সঙ্গে পাঁচজন শেরপা বন্ধুকে নিতে হয়েছিল।

গ্রেট ব্যারিয়ার ওয়াল

এছাড়া ওইসময়েই, এখন থেকে প্রায় চব্বিশ বছর আগে উমাসি লা পাস পেরোতে গিয়েও খুব কঠিন লেগেছিল। তখনতো পায়ে হাল্টার জুতো, দড়িদড়ার ব্যাপারটাও অতটা বুঝিনা। অত স্টিফ চড়াই কী করে যে উঠেছিলাম! এখন ভাবলে মনে হয়, হয়তো সেই বয়সে বলেই পেরেছি। এরকম অনেকগুলো পাসই আছে। ১৯৮১ সালে যখন গাঙ্গা লা ক্রস করি, সেটাতো খুব বেশি উঁচু নয়, তাও খুব দুর্গম মনে হয়েছিল। চাদর ট্রেকও তাই। পঁচিশটা গ্রাম নিয়ে জাঁসকর ভ্যালি। শীতকালে বরফ পড়ে ভ্যালিটা বাকি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন স্কুলে যেতে হলে, কেউ অসুস্থ হলে বা অন্য কোন দরকার হলে লে-তে আসতে হবে। অথচ যাতায়াতের কোন রাস্তাই নেই। স্থানীয় লোকজন দেখলেন জাঁসকর নদীটা শীতকালে যখন জমে যাচ্ছে, তার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া সম্ভব। তাঁরা এই পথে বহু বছর ধরেই যাতায়াত করছেন। এমনকী ছোট ছোট বাচ্চারাও বোর্ডিং স্কুলে আসছে। সেই কনসেপ্টটাকেই কাজে লাগিয়ে বিদেশিরা এসে ট্রেক শুরু করল। ব্যাপারটা যে খুব কঠিন তা নয়। কঠিন হল মাইনাস পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আমরা কতটা মানিয়ে নিয়ে থাকতে পারব সেটাই।

আবার সবচেয়ে ভালোলাগার ব্যাপারটা বলাও খুব শক্ত। একেকটা একেকরকম - একেকসময় একেকটা ভালোলেগে যায়। পাসের ওপর থেকে দুদিকে দুটো ভ্যালির ভিউ। যেমন কাং লাতে হিমাচলের সাইডটা একরকম - লাদাখের সাইডটা আরেকরকম - ফিচার পালটে যাচ্ছে, আকাশ পালটে যাচ্ছে, মেঘ পালটে যাচ্ছে, বরফের চরিত্র পালটে যাচ্ছে - এটাও খুব ইন্টারেস্টিং। আরেকটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল দোলপা ভ্যালির লামোসিয়াভঞ্জং-এ, সেই প্রথম আমরা কোন পাসে উঠি। দোলপা থেকে বর্ডারের দিকে যাচ্ছি - ওটাও একটা ইন্টারেস্টিং ভ্যালি ছিল আমার জীবনে। সেখানে একটা পাসের ওপর উঠে যখন প্রথম টিবেটান প্লেটোটা দেখতে পাই তখন সকলে মিলে খুব কেঁদেছিলাম। যেটা হয় - যে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ কান্নায় আসে। সবাই জড়িয়ে ধরে কাঁদছি যে এ কী দেখছি - সেই প্লেটো যা এতদিন বইতে পড়েছি বা ছবি দেখেছি! তখনতো এত টিভি - ইন্টারনেট ছিল না। তাই প্রথম দেখার আনন্দটা ভীষণভাবে পেয়েছিলাম।

◆ পাহাড় থেকে সাগরের কথায় আসি - পাহাড়ে ট্রেকিং-এর সময় নানান রোমাঞ্চ অপেক্ষা করে থাকে -অ্যাডভেঞ্চারের সেই তীব্র ব্যাপারটাতো কোস্টাল ট্রেকিং-এ অনেকটা কম। সমুদ্রের তীর ধরে পায়ে হাঁটার এই ভাবনাটা কীভাবে এল, ভালো লাগার জায়গাটাই বা কোথায়?

☐ কোস্টাল ট্রেকিং আমরা শুরু করেছিলাম ৮২ সাল নাগাদ। সেটাও হঠাৎ করেই। দুই বন্ধু মিলে বইমেলায় ঘুরছি, ঘুরতে ঘুরতে ইচ্ছা হল ভারতের কোস্টলাইনের টোটাল ম্যাপটা কিনে ফেলি। কিনে ফেললাম। ১৯৭৬ সালে পিণ্ডারির পথে আমার সঙ্গে কানাইলাল ঘোষের আলাপ হয়। এই যে অন্যরকম জায়গায় যাব, অন্যরকম বেড়াব আমার এইসব চিন্তাভাবনাই সম্পূর্ণ কানাইদার প্রভাবে - বলা যায় উনিই আমার গুরু। এবার ওই ম্যাপটা নিয়ে সোজা কানাইদার কাছে চলে গেলাম। বললাম কানাইদা, এরকম সমুদ্র ধরে হাঁটলে কেমন হয়? কানাইদা বলল, খুব ভালো। তারপর দু'জনে মিলে সমুদ্র ধরে হাঁটার যতরকম রেফারেন্স পাওয়া যায় ঘাঁটতে শুরু করলাম। এর পুরনো ইতিহাস কী আছে? ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমরা দুটো জিনিস পেলাম। প্রথমতঃ কানাইদার বাবা ৪০-৪২ সালে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলো হেঁটে হেঁটে ঘুরেছেন। সেইসময় কিছু কিছু মন্দির ঘোরার সময় সমুদ্রের ধার দিয়েও হেঁটেছেন। তারপর যে রেফারেন্সটা পেলাম সেটা হল, কোনারকের মন্দিরে যাওয়ার জন্য আগে কোন রাস্তা ছিল না। তখন পুরীতে যেত লোকে - পুরী থেকে হেঁটে কোনারক। অবস্থাপন্ন লোকেরা যেত গরুর গাড়িতে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই সমুদ্রের ধার ধরে হেঁটেই যেত।

www.amaderchhuti.com

টাঙ্গালে বীচ, শ্রীলঙ্কা

এইসব দেখেশুনে মনে হল হাঁটাই যাক না। ব্যস্ কানাইদা, আমি আর আমার এক বন্ধু বিশ্বজিৎ মিলে কোস্টাল ট্রেক শুরু করে দিলাম। প্রথমে খুব বেশি নয়, কোনারক থেকে চিলিকা। সেইটাই শুরু। তারপর দেখলাম, নাঃ, সত্যিইতো কোস্টাল ট্রেকটাও দারুণ ইন্টারেস্টিং। অনেকেই এখনো কোস্টাল ট্রেকিংকে ঠিক ট্রেকিং বলে মেনে নিতে পারেননা, আবার আমার মত অনেকের ভালোও লাগে। আসলে এটাও কিন্তু একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা। এতেও দারুণ বৈচিত্র্য আছে -আমি যখন একটা প্রভিন্স থেকে আরেকটা প্রভিন্সে যাচ্ছি তখন মানুষজন, ঘরবাড়ি, তার আদবকায়দা, কালচার, ফুড হ্যাবিট সব কীরকম পালটে যাচ্ছে। এইসব ফিচার বদলের পাশাপাশি সমুদ্রের রঙ, বিচের ফর্মেশন সেগুলোও কিন্তু পালটাচ্ছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় পুরীও যা মেরিনা বিচও তাই, আসলে কিন্তু তা নয়, সবটাই আলাদা, শুধু একটু গভীরভাবে দেখতে হবে।

কোস্টাল ট্রেকিং-এর আরও একটা মজা আছে। আমি যখন পাহাড়ে হাঁটছি - ধর হাকুরিতে আছি, কালকে পৌঁছে যাব থাতি। থাতিতে আমি জানি থাকার জন্য বাংলো পাব, চৌকিদার আছে রান্না করে দেবে। যেতে যেতে নদী পাব। অসুবিধা নেই, আমি নিশ্চিন্ত মনে হাঁটছি। কোস্টাল ট্রেকিংয়ে কিন্তু তা নয়। সকালে উঠে যখন আমি হাঁটছি, আমি কিন্তু তখনও জানি না যে বিকেল চারটের সময় কোথায় পৌঁছাব, রাতে কোথায় থাকব। কোন গ্রামের একটা ছোট ঝোপড়িতে থাকব, না মশারি টাঙিয়ে ঝাউবনে রাত কাটাব, নাকি একজনের ভালো বাড়ি পাব - রাজার হালে থাকব। সবকিছু গিয়ে যখন পাচ্ছি - সেটা যাই পাই না কেন একটা বিরাট আনন্দ। কোন একটা দিনে আমি কোথায় পৌঁছাব জানিনা, সেখানে কী পাব জানিনা, সেখানে মানুষ আমাকে কীভাবে অ্যাকসেপ্ট করবে তাও জানিনা - সেখানে গিয়ে পৌঁছনোর অভিজ্ঞতা, অচেনা মানুষের ভালোবাসা - সব মিলিয়ে একটা অন্যরকম অনুভূতি।

◆ ভারতের দীর্ঘ উপকূলতো বটেই, বাংলাদেশ - শ্রীলঙ্কার তটরেখা ধরে ট্রেক করেছেন, হেঁটেছেন নর্মদার উৎস থেকে সঙ্গম পর্যন্ত - কোন ট্রেকিংটা সবচেয়ে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে? এখনতো মাওবাদী হামলা, টেররিজম ইত্যাদি নানান সমস্যা - কোস্টাল ট্রেক করতে গিয়ে এগুলো কোন অসুবিধার সৃষ্টি করেনি?

☐এটাও ঠিক ওভাবে বলাটা শক্ত। কর্ণাটকে আমরা কটা বিচের কথা জানি বলতো? লোকে গণপতিফুলে বেড়াতে যায়, আজকাল তারসঙ্গে যোগ হয়েছে কারওয়ার। কিন্তু কর্ণাটকে যে কত সুন্দর সুন্দর সৈকত আছে আমি যদি পুরোটা হাঁটতে না পারতাম তাহলে দেখতেও পেতাম না, লোককে দেখাতেও পারতাম না। মানুষ হিসেবেও সবচেয়ে ভালো পেয়েছি কর্ণাটকের লোকজনকে। ইস্টার্ন কোস্টের দিকে পাহাড়-সাগর মিলিয়ে ওয়ালটেয়ার খুব সুন্দর। শ্রীলঙ্কার সমুদ্র আর সৈকত দুইই খুব কালারফুল। আন্দামানের বিচতো আমরা একদম প্রায় জানিইনা। সমস্ত ব্যাপারটা এত লোনলি। গ্রাম নেই, কিছু নেই, ধুধু সমুদ্রের ধার ধরে হাঁটছি -এত নীল আর এত সবুজ - এই নীল আর সবুজের মেলবন্ধনটা আমাদের এখানে আর কোন সৈকতেই দেখা যায় না। সবুজ জঙ্গল আর নীল সমুদ্র -জলেও নীল-সবুজের মিলেমিশে যাওয়া...।

নর্মদা নদী, কাবেরী নদী ধরেও আমি হেঁটেছি। সেটাও খুব ইন্টারেস্টিং। কাবেরী নদী ধরে হাঁটতেও বেশ ভাল লাগে। কর্ণাটকের ভেতর দিয়ে - শুধু যে গর্জের ফিচার তা নয়, দুদিকে সুন্দর পাহাড়, মানুষজনও দারুণ, সেটাও একটা বিরাট পাওনা।

যেহেতু উপকূলের গ্রামগুলিতেও এখন টি.ভি., খবরের কাগজ পৌঁছে গেছে, লোকজনের টেলিফোন রয়েছে -স্বাভাবিকভাবেই অচেনা মানুষ সম্বন্ধে তারাও এখন অনেক বেশি সতর্ক। থানায় ফোন করে দিচ্ছে, পুলিশ চলে আসছে। পুলিশকে কনভিন্স করতে হচ্ছে। কনভিন্সড না হলে থানায় নিয়ে যাচ্ছে, কাগজপত্র দেখে তবে ছাড়ছে। কোস্টাল ট্রেকিং-এ এইসব অসুবিধাতো রয়েইছে। তবে এগুলো কিছু না, এটাও পথচলারই একটা অঙ্গ। এসব হচ্ছে বলে আমি কোস্টালে যাব না, তাতো হয়না। এই ব্যাপারটা অনেকবারই ফেস করেছি। আমাকে কখনও এল.টি.টি.ই.-রা ধরেছে পুলিশের ইনফর্মার বলে, আবার পুলিশে ধরেছে এল.টি.টি.ই.-র লোক ভেবে। রাত বারোটার সময় ঘিরে ফেলেছে। কখনো এমনও হয়েছে যে কোন গ্রামের লোক গ্রামেই ঢুকতে দেয়নি, আবার কোথাও গ্রামের মানুষই রান্না করে এনে খাইয়েছে। এগুলো হবেই, থাকবেই, এর মধ্যেই যেতে হবে। শুধু তারজন্য যা কিছু করণীয়, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সব করে নিয়ে যেতে হবে।

◆ আপনার ট্রেকিংয়ের অভিজ্ঞতাগুলো বেশ অন্যরকম -অনেকসময় গাইড বা পোর্টার ছাড়াই বেরিয়ে পড়েছেন, সঙ্গী করে নিয়েছেন চেনা-অচেনা আগ্রহী মানুষকেই, খুব কম খরচে ঘুরে বেরিয়েছেন দিক-দিগন্ত। এই অন্যরকম বেড়ানোর প্রস্তুতিটা নেন কীভাবে?

☐আমি যে টিমটা সেট আপ করি, তাতে সকলেই যে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল তা নয়। আমি আজ যে টাকাটা অ্যার্ফোড করতে পারি, মেম্বারদের মধ্যে অনেকের পক্ষেই সেটা সম্ভব নয়, সেইভাবেই আমাকে চিন্তাভাবনাটা করতে হয়। এছাড়াও ট্রেক করতে গিয়ে আমি মিসইউজটা একদম বরদাস্ত করতে পারি না। কোন কোন টিমে দেখি এজেন্সির মাধ্যমে গাইড, পোর্টার নিয়ে যাচ্ছে, তারাই সব করছে, প্রচুর জিনিসপত্র মিসইউজ করছে, আমার সেটা খুব গায়ে লাগে। সেইজন্য আমাদের প্ল্যানিং থাকে যে আমরা নিজেদের কাজটা নিজেরাই করব। রান্না করা, বাসন মাজা, নিজেদের টেন্ট টাঙানো-গোটানো সবটা নিজেদেরকেই করতে হয়। এতে লোক-ও কম লাগে আর খুব বেশি খাবারদাবার নেওয়ারও দরকার হয় না। খরচটা অনেক কমে যায়। আবার ধরো, আট জনের টিম করলে খুব সুবিধা হয়। একটা গাড়ি নিতে পারি, দুটো টেন্ট নিতে পারি, আমার যে প্রেসার কুকারটা আছে তাতে আট জনের খাবার হতে পারে। সংখ্যাটা এদিক-ওদিক হলে কিন্তু খরচাটাও এদিক-ওদিক হয়ে যায়। খাবার-দাবার যে অন্য টিমের তুলনায় খারাপ খাই তাও কিন্তু নয়, যথেষ্ট ভালো খাবারই খাওয়া হয়। কিন্তু তাও অন্য যে টিম ওই ট্রেকটা করবে তার তুলনায় খরচটা কোথাও হাফ, এমনকী ওয়ান

ধৌলাগিরি

www.amaderchhuti.com

থার্ডও হয়ে যায়। আমরা দেখেছি যে একমাসের ট্রেকিং প্রোগ্রামে মাথাপিছু ৮-১০ হাজার টাকার বেশি খরচ পড়েনি।
বড় বড় প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে পুরো ট্রেকটাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নিয়ে ঠিক করে নিই কলকাতা থেকে কী নিয়ে রওনা দেব আর ট্রেকিং পয়েন্টগুলোতে কোথায় কী কিনব। বিশেষ করে খাবারদাবার। এতে লাগেজটা অনেক হাল্কা হয়। যেমন লামখাগা-বোরাসু-ধুঁমধার ট্রেকের সময় ২০ দিনের খাবারটা না নিয়ে ৫-৬ দিনের খাবার নিয়ে চলা শুরু করলাম। মাঝে বোরাসুর আগে ছিটকুল থেকে আবার পরে ধুঁমধারের আগে সাকরি থেকে বাকি খাবারটা তুলে নিলাম। এতেও খরচা কমে। কোস্টালে তো খরচ আরো কম - সঙ্গে মাত্র একদিনের খাবার রাখি। বাকিটাতো সবই পথে-পথে - যা পাই, তাই খাই। অনেকক্ষেত্রে কারোর বাড়িতেই খাইয়ে দেয়। নিজেরা রান্না করলেও খুব সামান্য। তাই খাওয়ার খরচা তেমন নেই আর থাকার খরচাতো প্রায় লাগেই না। এভাবে প্ল্যান করে সুন্দরভাবেই ঘুরে আসা যায়।

◆ আবার পাহাড়ে ফিরি - সিকিমে একবার ট্রেকিং করতে গিয়ে আপনি প্রায় হারিয়ে গিয়েছিলেন - সেই গল্পটা একটু বলুন।

□হারানোর ব্যাপারটাতো আর কারোর ওপর দোষ দেওয়া যায় না, নিজেদেরই দোষ - হয়তো ঠিকমতো ম্যাপটা রিড করতে পারিনি বা ইনফর্মেশন যা ছিল সেটা হয়তো যথেষ্ট ছিল না। সেটা ১৯৯২ সাল, কাঞ্চনজঙ্ঘা অঞ্চলের নর্থ ওয়েস্ট আর সাউথ ওয়েস্ট ফেসের বেসক্যাম্প দুটো ট্রেক করে সিকিমের দিকে ফিরছিলাম। এই পথে মূল সমস্যাটা ছিল গাইডের। পুলিশের ঝঞ্ঝাটের জন্য নেপালের লোক সিকিমে আসতে চায় না। তাই গাইড, পোর্টার কিছু পাইনি। একজন খানিকটা দূর এগিয়ে দিয়ে সামান্য কিছু পথনির্দেশ দিয়েছিল। আমাদের কাছে যে ম্যাপটা ছিল সেটাও খুব পরিষ্কার ছিল না। আর যেখান থেকে হারানোটা শুরু হয়েছিল সেখানটাতে প্রচন্ড ফগ হয়েছিল, কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। আবার যেটা হয় যে ট্রেকিং-এ একবার যদি ৫-৬ হাজার ফুট নেবে গিয়ে একটা নদীর ধারে পৌঁছান যায় তখন কিছুতেই মনে হবে না যে আবার ৫-৬ হাজার ফিট ওপরে উঠে অন্যদিকে দেখি। সেবারে আমরা যে নালাটার ধারে পৌঁছেছিলাম সেটা হল রাথাং-চু নালা। এদিকে আমাদের মাথায় কাজ করছে যে ওটা রামথাং নালা। আমরা ধরে রেখেছি রামথাং নালা -তারপাশে রামথাং গ্রাম - অথচ কিছুই মিলছে না। কখনো গর্জের মধ্যে দিয়ে, কখনো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটছি, উঠছি, নামছি, কেউ পড়ে গিয়ে আহত হচ্ছে, নদীর এপার ওপার করছি...। ট্রেকিং-এর শেষে খাবার দাবারও তেমন নেই, এপথ ওপথ করতে গিয়ে কিছুটা হারিয়েও গেছে। শেষে যা থাকে কপালে বলে দু'তিনজনকে খালি হাতে নীচে পাঠিয়ে দিলাম। যাই হোক শেষ পর্যন্ত পনেরো দিন প্রায় না-খাওয়া অবস্থায় থাকার পর রেসকিউ টিম এসে আমাদের উদ্ধার করে।

ধৌলাগিরি - দেওরালি থেকে

◆ ম্যাপের কথা এল যখন আরেকটা প্রশ্ন করি, এখনতো ইন্টারনেটের সুবাদে গুগল ম্যাপ দিয়ে কোথায় যাচ্ছি, জায়গাটা কেমন একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে নেওয়া যায়। আগে তো এসব সুযোগ ছিল না কিন্তু কোন জায়গায় পৌঁছে নতুন কিছুকে দেখার-চেনার আনন্দটা ছিল। এই ব্যাপারটায় সুবিধা-অসুবিধা কী মনে হয় আপনার?

□ইদানীং যেটা হচ্ছে যে কন্ট্যুর ম্যাপ থাকবে না গুগল ম্যাপ? এই নিয়ে একটা সেমিনারও হয়েছিল। যখন ট্রেক শুরু করেছিলাম তখন ব্যাপারটা ছিল যে আমরা কিছু ম্যাপ দেখতাম। একটু বেশি করে যারা দেখত তারা কন্ট্যুর ম্যাপ ব্যবহার করত - তাতে উঁচু নীচু কোথায় কী আছে, কোথায় গ্র্যাডিয়েন্ট বেশি আছে এটা বোঝা যেত। কোথায় ভালো বুগিয়াল পাব এটাও কিছুটা বোঝা যেত। কিন্তু সামনে কী দৃশ্য দেখব, রাস্তায় একটা গ্রাম পাব কিনা সেটা বোঝা যেত না। ফলে আমরা যখন একটা গ্রাম দেখতাম পাহাড়ের গায়ে, নতুন একটা দৃশ্য দেখার আনন্দ পেতাম - অচেনার আনন্দ। সেই অনুভূতিটা কিন্তু বদলে গেছে। সুবিধাতো হয়েছে ঠিকই। এখন যে জেনারেশনটা পাহাড়ে যাচ্ছে তারা যাওয়ার কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই গুগল-এ টাইপ করছে ম্যাপ দেখার জন্য - জায়গাটাকে দেখা-ও হয়ে যাচ্ছে সেখানেই! সে যখন ট্রেক করতে গিয়ে সেই গ্রামটা দেখতে পাচ্ছে তখন তার মনে হচ্ছে আরে, একদম মিলে গেছেতো! সেও আনন্দ পাচ্ছে, তবে সেটা মিলিয়ে নেওয়ার আনন্দ। দুটো অনুভূতি কিন্তু একেবারে আলাদা।

◆ কখনো শিখর ছোঁয়ার ইচ্ছে হয়নি?

□আমি একটাই পিকে উঠেছি, ১৯৭৭ সালে, ভানোটি পিক। তার ঠিক আগের বছরই কানাইদার সঙ্গে আলাপ। কানাইদারা ওই পিকটা তখন সদ্যই ক্লাইম্ব করে এসেছে। আমার সঙ্গে আলাপ হতেই কানাইদা বলল, তুই চলে যা - আমিতো ছোলা খেতে খেতে উঠে পড়েছি, তুই বাদাম খেতে খেতে ঠিক উঠে পড়বি। আমিও ভাবলাম চলেই যাই। পরের বছর যখন ট্রেক করতে গেলাম তখন পদম সিংকে গাইড নিয়েছিলাম। ওকে বললাম, এই পিকটায় উঠব আমার দাদা বলে দিয়েছে। ও বলল যে যখন আগস্ট মাস থাকে, বরফ কম থাকে তখন 'বকরি ভি উঠ সকতা তো তুম কাঁহে নেহি?' সেটাই আমার প্রথম পাহাড়ের মাথায় ওঠা।

আসলে আমি ট্রেকিংয়ে যাব না মাউন্টেনিয়ার হব সেটা কিছুটা পারিপার্শ্বিক ব্যাপার। আমার ক্ষেত্রেও এই কানাইদা, সেজকা অর্থাৎ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসার জন্য ট্রেকিংয়ের ব্যাপারটাই ভালোলাগার জায়গা করে নিয়েছে। দুটোর ধরণটাও অনেকটাই আলাদা। পিকের ক্ষেত্রে আমি যত তাড়াতাড়ি পারি বেসক্যাম্পে পৌঁছাব, তারপর আমার দক্ষতা দিয়ে চূড়ায় উঠব। ট্রেকিং-এর মজাটা কিন্তু অন্য জায়গায়। আমরা ট্রেকিং করতে গিয়ে গোটা হিমালয়টাকে দেখি। নদী-নালা-জঙ্গল-পাহাড়-গ্রাম দেখতে দেখতে একটা ভ্যালি থেকে আরেকটা ভ্যালিতে যাই। ক্লাইম্বিং- এ অ্যাডভেঞ্চারটা অনেক বেশি থাকে কিন্তু ট্রেকিংয়ে দেখার ব্যাপারটাই অনেকটা। আমার এই দেখার আনন্দটাই বেশি ভালো লাগে। আমার হিমালয়ে মানুষ থাকবে, ভ্যালি থাকবে, পিক থাকবে, অ্যাডভেঞ্চার থাকবে, নীল

অন্নপূর্ণা - ১ শৃঙ্গ

আকাশ থাকবে - সব থাকবে। গত শীতে যখন চাদর ট্রেক করতে গেলাম তখন অনেকেই আমায় বলেছিল যে, আপনিতো বহুবার লাদাখ গেছেন, আবার কেন? আমি তাদের উত্তর দিই ওদিকটা আমার দেখা হয়নি। আমি নতুন কোন জায়গায় গেলাম কিনা, কী পাস অতিক্রম করলাম সেটা বড় ব্যাপার নয়, দেখাটাই বড়, সবটুকু দেখা। সেভাবে সিগনিফিকান্ট নয়, লোকজন হয়তো চিনবেনা এমন অনেক জায়গাও ট্রেক করেছি। যেমন ওয়েস্ট নেপালে কর্ণালী নদীকে অনুসরণ করে ট্রেকটা। এটা আসলে তিনটে নদী - দোলপো কর্ণালী, মুহু কর্ণালী আর হুমলা কর্ণালী। আমাদের এখানে এই নদীটাই এসে ঘর্ঘরায় মিশেছে। তিনটে নদীকে বেস করে হুমলা, মুহু আর দোলপো ভ্যালিটাও দেখা হয়ে গেল। এটা একটা অন্য রকম আনন্দ।

◆ মাঝেমধ্যেই কাগজ খুললে ট্রেকিং-এ গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন এমন খবর চোখে পড়ে। ট্রেকিং ব্যাপারটা এখন এতই জনপ্রিয় হয়েছে যে অনেকসময় অ্যাডভেঞ্চারের ঝোঁকে অনেকে যথেষ্ট প্রস্তুতি ছাড়াই বেরিয়ে পড়ছেন বেশ কঠিন ট্রেকিং-এ, বিপদেও পড়ছেন এমন একটা কথাও শোনা যাচ্ছে। এই প্রবণতাটা আপনি লক্ষ্য করেছেন?

☐আমিতো সান্দাকফু থেকে শুরু করেছি। সেখান থেকে একটা স্টেজে আসতে আমার দশ-বারো বছর সময় লেগেছে কিন্তু এখন চারদিকে যেভাবে এটাকে পপুলারাইজ করার জন্য মিডিয়াগুলো আছে, ম্যাগাজিনগুলো আছে, নেট আছে, এইসব করে কিছু মানুষ হঠাৎ করেই এদিকে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে পঁচানব্বই শতাংশ দুর্ঘটনা ঘটে নিজেদের জন্য। এর অনেকগুলো কারণ আছে। অত্যুৎসাহ তো একটা কারণ বটেই তাছাড়াও নিজের রোগকে চেপে যাওয়া, ভুল তথ্য জানা এসব অনেক ব্যাপার কাজ করে। কোন একটা লেখা পড়ে ট্রেকে গেছে, লেখায় হয়তো যাওয়ার সময়টা দেওয়া ছিল না বা সেখানে হয়তো লেখা আছে মে মাসে ট্রেকিং করার কথা, তার বদলে সেখানে অক্টোবর-নভেম্বরে চলে গেল। এতে যে কী মারাত্মক হ্যাজার্ড হতে পারে, সে ধারণাটাই তাদের নেই! আমরা কলকাতায় ফিরে এসে বলি ওখানে ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ হয়েছে, হ্যাজার্ডস হয়েছে, স্নো ফল হয়েছে - এগুলো সব বানানো এক্সকিউজ, নিজেদের পিঠ বাঁচানোর জন্য বলা। আরেবাবা প্রকৃতি যেরকম আছে, সেরকমই থাকবে, সেখানে বিপদ আছে বলেই তো অ্যাডভেঞ্চার। নিজে না পারলে তার জন্য প্রকৃতিতো দায়ী নয়, সেতো নিজের খেয়ালেই চলবে। তাকে সমীহ করে তবেই পাহাড়ে যাব। সেটা যদি না বুঝিতো ফল ভুগতেই হবে।

www.amaderchhuti.com
বরফের প্রাচীর পেরিয়ে - কাং লায়

◆ ট্রেকিং করতে গিয়ে আপনি এত অপূর্ব সব ছবি তুলেছেন, প্রথম থেকেই কি ভালো ক্যামেরা দিয়ে শুরু করেছিলেন নাকি খুব সাধারণ ক্যামেরা দিয়ে শুরু করে ধাপে ধাপে আরও ভালো ক্যামেরা ব্যবহার করেছেন? আসলে এত ভালো ছবির মধ্যে ডুবে গেলেন কীভাবে?

☐প্রথম জীবনে আমি ক্লিক-থ্রি ক্যামেরা ব্যবহার করতাম। তারপরে আমার হাতে এল আগফা-র আই সোলি - টু - কোডাক ক্রোমা - এভাবে আস্তে আস্তে ক্যানন, নিকন।

ছবি তোলার ব্যাপারটাতেও বলা যায় বেশ কিছু মানুষের ইনফ্লুয়েন্স কাজ করেছে। যাদের সঙ্গে বেড়িয়েছি - কানাইদা, শুভময় মিত্র, বিভুতিভূষণ বসু, শঙ্করবিজয় সাহা এদের সংস্পর্শে এসে। তাছাড়া আমিতো PAD–র ছাত্র - বেনুদার ওখানেই আমার ফটোগ্রাফির পড়াশোনা। এইসব কিছুই আমার ছবি তোলায় প্রভাব ফেলেছে।

আমি ট্রাভেল ফটোগ্রাফিটাকে দুটো সেক্টরে ভাগ করি। একটা হচ্ছে বেশিরভাগ লোক যেটা করে, তারা যে বেড়াতে গেছে সেই ব্যাপারটাই ছবির মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করে। অন্যদিকে আমাদের চেষ্টা থাকে যে আমি যে জায়গাটায় বেড়াতে গেছি সেই জায়গাটাকে ছবির মাধ্যমে যতটা সম্ভব তুলে ধরা যায় সেটার চেষ্টা করা। নিজেদের ছবি খুব কমই তুলি - ডকুমেন্টেশনের জন্য দু' একটা ছাড়া। আসলে ছবি তুলতে গেলে এটা মাথায় রাখা দরকার যে এই ছবিটার সঙ্গে আমার হয়তো অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে কিন্তু যে দর্শক এটা দেখছে তার কাছেও কি তাই? সে এটার সাথে নিজেকে রিলেট করবে কি করে? আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে পথ চলতে চলতে কোনটাতে একটা ভাল ছবি হতে পারে সেই ধারণাটা ঠিক সময়ে করতে পারা। এখন না হয় ডিজিটাল ক্যামেরায় অজস্র ছবি তুলতে পারি কিন্তু আগে ব্যাপারটা ছিল -সঙ্গে চারটে রোল আছে, তার মধ্যেই বেছে বেছে ছবি তুলতে হবে। তখনই আমাকে বুঝতে হবে ছবিটা আদৌ হবে কী না, ছবিটা তুলতে হলে আমাকে নীচে নামতে হবে কী ওপরে উঠতে হবে। ভালো ছবি তোলার জন্য প্রয়োজনে এই নড়াচড়া করার মানসিকতাটাও থাকা চাই। এছাড়া যেটা দরকার সেটা হল প্রচুর ছবি দেখা। দেখলেই আস্তে আস্তে ছবি তোলার ধারণাটা তৈরি হয়। তারপর এই যে ছবি দেখে লোকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে সেটাই আমার কাছে ইন্সপিরেশন। সেটা পেয়েছি বলেই আরও ম্যাচিওর হতে পেরেছি।

◆হাই অল্টিচিউডে ছবি তোলার ক্ষেত্রে কিরকমভাবে তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত - কী ক্যামেরা, কী লেন্স? ক্যামেরাটাই যথেষ্ট ভারি -কত কম জিনিস নিয়ে ভালো ছবি তোলা যাবে?

☐ আগেতো জুম লেন্সের প্রচলন ছিল না, তখন আলাদা আলাদা সব লেন্স নিতে হত। ধৈর্য ধরে একটা খুলে আরেকটা লাগাতে হত। তখনকার জুমগুলো এত ভালোও ছিল না, থাকলেও সেটা ছিল আমাদের ক্যাপাসিটির বাইরে। তবে এখনতো সাধ্যের মধ্যে জুম লেন্স এসে গেছে। পাহাড়ে ট্রেক করতে গেলে অবশ্য খুব হাই জুম দরকারও হয় না। কিন্ত অন্ততঃ ২৪ বা ২৮ মিমি লেন্স ছাড়া ছবি হয়না পাহাড়ে। আমিতো একটা পিকের বেশ কাছেই যাব, তাই ওয়াইডটা আমার প্রধান দরকার। ২৪-১৩৫ মিমি এই রেঞ্জের লেন্স হলেই যথেষ্ট। ডিজিটালের ক্ষেত্রে এটা হবে ১৮-১০৫ মিমি। এতেই কাজ হয়ে যায়। কম্পোজিশনের ব্যাপারটাও এখন অনেকটা সুবিধা হয়ে গেছে ডিজিটাল হওয়াতে। আবার ডিজিটালের প্রধান যে সমস্যাটা আগে হতো অর্থাৎ ব্যাটারির ব্যাক আপ, এখন সেটাও খুব ভালো। আমার চাদর ট্রেকে মনে আছে নিকনের দুটো ব্যাটারি নিয়েছিলাম, তারমধ্যে একটা লাগেনি আর আরেকটা মাত্র একটা দাগ খরচা হয়েছে ওই মাইনাস ৩৫ ডিগ্রি টেম্পারেচারে, পাঁচশোটা ছবি তোলার পর। অনেকে সোলার চার্জারও ব্যবহার করেন। তবে ডিজিটাল ফটোগ্রাফি করতে গেলে কম্পিউটারটা ভালোভাবে জানা দরকার, নাহলে ফাইনাল প্রেজেন্টেশন ভালো হবে না। আর একটা ব্যাপার হল সকলে যদি ভাবে যে সব ক্যামেরা দিয়েই সবকিছু হয়ে যাবে, সেটা হয় না। আমি তো দুটো জেনারেশনেই ছবি তুলেছি, তুলছি - অ্যানালগেও তুলেছি, ডিজিটালেও, তাই দুটোর ডিফারেন্সটা দেখতে পেয়েছি। এখন ডিফারেন্সটা ক্রমশঃ কমে আসছে। আমি অ্যানালগে তুলে দেখেছি সেখানে নীল আকাশ পেয়েছি, সাদা মেঘ পেয়েছি - ফিল্মের এক্সপোজার ল্যাটিচুডটা অনেক বেশি। ডিজিটালের ভাষায় বলতে গেলে মেগাপিক্সেলও বেশি। ডিজিটালেও অবশ্য এখন ওই রেজাল্ট পাওয়া সম্ভব তবে অনেক দামী ক্যামেরায় - সে আর ক'জন ব্যবহার করবে? কিন্তু এখানকার জেনারেশনতো এই ডিজিটাল ছবিটাকেই দেখবে। তারা তো ওটা দেখবেনা। তারা জানবে এটাই লাদাখের আকাশ, এটাই ছবি। তারা যদি অ্যানালগে লাদাখের ছবি দেখে ভাববে ওটাতে বোধহয় কিছু অতিরঞ্জিত করা হয়েছে, হয়তো ফিল্টার-টিল্টার দেওয়া ছিল তাই আকাশ এত নীল হয়েছে!

◆ভ্রমণলেখক হিসেবে আপনার চোখে বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের মূল্যায়নটা ঠিক কী?

ফোকসুমদো লেক

□বিভিন্ন সেমিনারে, আলোচনায় এ বিষয়ে যে কথাটা উঠে এসেছে সেটা হল আমাদের এখানে সাহিত্যের অন্যান্য ধারাগুলোয় যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে কিন্তু বাংলা ভ্রমণসাহিত্যটা সেভাবে বেড়ে ওঠেনি। তার কারণ আমাদের এখানে যাঁরা ভালো সাহিত্য রচনা করতে পারেন তাঁদের প্রায় কেউই এই ব্যাপারটায় মানে ট্রেকিং বা ক্লাইম্বিং-এ যাননি। আবার যাঁরা ট্রেকিং বা ক্লাইম্বিং করেন তাঁরা লেখার জন্য কলম ধরেননি, লেখার জগতে আসেননি। এই দুটো জিনিসের মধ্যে মিলনটা খুব কমই হয়েছে। আবার সাম্প্রতিককালে দু'একজন যারা ভালো লিখত তারা প্রায় লেখেইনা - যেমন অনিন্দ্য মুখার্জি। তাও কিছুদিন আগে পর্যন্ত যেসব পূর্ণাঙ্গ বইগুলো বেরতো তার মধ্যে আমরা ভ্রমণসাহিত্যের রস পেয়েছি বা কেন বেড়াতে যাব সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়েছি। এখনকার বেশিরভাগ লেখায় কিন্তু সেই ভাবনাটা চলে যাচ্ছে। হয়তো লেখকের কিছু গাফিলতি আছে বা বিভিন্ন পাবলিশিং হাউস তার কাছে এটা ডিমান্ড করছে যার ফলে লেখা হয়ে যাচ্ছে তথ্য নির্ভর - নিজের অনুভূতিগুলোকে ঠিকমতো ব্যক্ত করতে পারছে না। আরও একটা ব্যাপার আছে সেটা হল জায়গাগুলোর ডিফারেন্স ফুটে উঠছে না। আমি দীঘার সমুদ্রে গিয়েও যে বর্ণনা দিচ্ছি, পুরীতে গিয়েও সেই বর্ণনাই দিচ্ছি, আবার গোয়ার সৈকতে গিয়েও একই কথাই লিখছি। তাহলে তিনটের মধ্যে পার্থক্য কী হল? তারজন্যেও মানুষ বিভ্রান্ত হয়। আরও একটা ব্যাপার আছে। আগে বীরেন্দ্রনাথ সরকার, শম্ভুদা লিখতেন। তাঁরা লিখতে গিয়ে দিনের পর দিন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বা অন্যান্য লাইব্রেরিতে পড়ে থাকতেন, পড়াশোনা করতেন। লিখতেন কম, পড়তেন বেশি। এখন একটা ম্যাগাজিন পেলে হয়তো লোকে নিজের লেখাটায় চোখ বোলায়, বাকি অন্য কিছু পড়েনা। পড়া যদি কমে যায় তাহলে তার মধ্যে আর সাহিত্য রচনা আসবে কোথা থেকে? সেই কবে স্কুল বা কলেজে বাংলা পড়েছি তাই দিয়ে যদি লিখতে আরম্ভ করি তাহলে তো খুব মুশকিল।

◆পথ চলতে চলতে আপনিতো বহু মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, সমৃদ্ধ হয়েছেন - তেমন কিছু মানুষ, মনে রাখার মত কোন চরিত্রের কথা একটু বলুন।

□৭৭ সালের কথা বলি। জিতরাম নামে একজনকে পেয়েছিলাম। কুমায়ুনের ওয়াছামের বাসিন্দা। ভারি অদ্ভুত মানুষ। আমি হেঁটে যাব, সে আগে চলে যাবে। রাস্তাটা তৈরি করে রাখবে। খেয়াল রাখবে আমার যাতে গায়ে বিছুটি না লাগে, জুতোটা না ভিজে যায়। এত দরদী মানুষ, সমস্ত দিক দিয়ে এত ভালোবাসা। এখন আছে মঙ্গল সিং - উত্তরকাশীর। সেও তাই। আমি যখন যাব সে আমাকে প্রাণপণে আগলে রাখার চেষ্টা করে। আমি বলি, তুমি চলে যাও, আমি ঠিক চলে যাব। গালাগালি দিলেও যাবে না, চুপটি করে বসে থাকবে। এরকম প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছি। কত গ্রামের মানুষের কাছ থেকে আদর-যত্ন, ভালোবাসা পেয়েছি, সেসব বলতে গেলে তো শেষ হবে না। একটা ঘটনা মনে পড়ছে। অন্ধ্রপ্রদেশের একটা গ্রামে ঢুকেছি। সেটা কৃষ্ণা-গোদাবরী বেল্টে। ঢুকে বললাম, আমাদের একটু জায়গা দাও, একটু জল দাও, রান্নাবান্না করে খাব। ওরা সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের স্কুলে ব্যবস্থা করে দিল। অনেক করে বারণ করলাম তাও স্কুল ছুটি দিয়ে দিল। স্কুলের পাশে একটা জায়গা দিল। তারপর বলল, রান্না করে খাবে এত কষ্ট করবে কেন? আমি বললাম, তোমরা কেউ যদি রান্না করে দাও তাহলেতো ভালোই হয়। ওরা বলল, আমরা তো কৈবর্ত, ছোট জাত - জেলে, আমাদের হাতে খাবে? বললাম, কোন আপত্তি নেই। তোমাদের কোন মেয়েকে দিয়ে যদি রান্নাটা করে দাও। বলল, না, না, মেয়েদের দিয়ে হবে না। তারপর গ্রামের মোড়ল পুকুরে গিয়ে স্নান করে নতুন ধুতিটুতি পরে এল। এসে রান্না করে খাওয়ালো তো বটেই, অনেক দূর পর্যন্ত রাস্তা সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌঁছে দিয়ে গেল।

www.amarboi.com

আরেকবার তখন কাঞ্চনজঙ্ঘা বেসক্যাম্প ট্রেকিং-এ গেছি। পোর্টার পাওয়া খুব সমস্যা ওই অঞ্চলে। টিম ম্যাকারনির দল ছিল সঙ্গে। ওর দলের লোকেরাই ভাগাভাগি করে আমাদের সাহায্য করে দিত। টিম ম্যাকারনির স্ত্রী আর্নি ম্যাকারনি ছিলেন ডাক্তার, তাঁর সঙ্গে আমাদের এতটাই হৃদ্যতা হয়ে গিয়েছিল যে প্রতিদিন ট্রেকিংয়ের পর আমাদের সকলের চেকআপ করতে আসতেন, সবাই ঠিকঠাক আছি কিনা। ওঁদের সঙ্গে সেবারে প্রায় বাইশ-তেইশ দিন কাটিয়েছিলাম।

অনেক সময় অদ্ভুত লোকের দেখাও পাওয়া যায়। তেমন একটা ঘটনার কথা বলি - সেটাও অন্ধ্রপ্রদেশের একটা জায়গায়। পৌঁছে দেখি নদী পার হওয়া যাবে না, নৌকো নেই। সেখানেই রাত কাটাব ঠিক করে বাবলা কাঁটা-ফাটা পরিষ্কার করে মশারি টাঙিয়ে নিলাম। অনেক রাত্তিরে জঙ্গল থেকে একটা লোক এসে উদয় হল। রাত তখন বারোটা-একটা হবে। সে আমাদের দিকে একবার দেখল, তারপর ভ্রূক্ষেপ না করে জঙ্গলে ঢুকে কিছু কাঠকুটো নিয়ে চলে এল। আমরা বার বার তাকে এটা ওটা জিজ্ঞাসা করলাম, কোন উত্তরই দিল না। তারপর সামান্য যা পোশাক ছিল খুলে জলের মধ্যে নেমে পড়ল। জায়গাটা খাঁড়ির মত। নির্জন। কয়েকবার ডোবাডুবি করে মাছ ধরে নিয়ে এল। আগুন ধরিয়ে মাছগুলো পুড়িয়ে খেল। আগুনে একটু হাত পা সেঁকল। আবার জলে নেমে গেল। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ফের মাছ ধরে নিয়ে এল। এরকম দু'তিনবার করে তারপরে আবার জামাকাপড় পড়ে জঙ্গলে চলে গেল। লোকটা পাগল না বোবা-কালা কিছুই বুঝতে পারলাম না!

◆ এতদিন ধরে আপনি পথ হাঁটছেন - পাহাড়ের পরিবেশ বদলে যাচ্ছে, গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে, কোস্টলাইন ভেঙ্গে যাচ্ছে - প্রকৃতি বাঁচাতে ভ্রমণপ্রেমী, ট্রেকার, মাউন্টেনিয়ার - সবার কাছে আপনার বার্তা কী?

□আমরা যারা ট্রেক করতে যাই, বেড়াতে যাই, তাদেরকে অনেকেই তো বলেন যে গাছ লাগান, বীজ নিয়ে যান, এই করুন, ওই করুন। আমার মনে হয় এসব কিছুরই প্রয়োজন নেই, শুধু আমরা কিছু নষ্ট করব না, নোংরা করব না এই ব্যাপারটা মাথায় রাখলেই চলবে। একবার একটা দলের সঙ্গে আমাদের দেখা - হর কি দুন থেকে টিমটা ফিরছে। দেখি তাদের প্রত্যেকের বোঝার পেছনে বড় বড় জুনিপারের ঝাড় আটকানো। জিজ্ঞাসা করলাম, এসব কী করবেন? বলল - জানেন, এগুলো কাঁচা অবস্থায় জ্বলে আর ধূপের মতো গন্ধ বেরোয়। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে অফিসের বন্ধুদের টুকরো টুকরো করে দেব। এই যদি মানসিকতা হয় তাহলে কী হবে? আবার কোস্টাল এরিয়ায় যেমন দেখা যায় কখনো হয়তো সরকার থেকে গাছ লাগানোর প্রকল্প হয়েছিল, জলটল দেয়নি, বেশিরভাগই মরে গেছে। অথচ চারাগাছগুলো যে প্লাস্টিকে করে এনেছিল সেই প্লাস্টিক ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র - পুরো জায়গাটা গাছের বদলে প্লাস্টিকে ভরে গেছে।

ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ওড়িশা-অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে প্রচুর অলিভ রিডলে কচ্ছপ ডিম পাড়তে আসে। আন্দামান ও শ্রীলঙ্কার সৈকতেও এটা দেখা যায়। এইসময় নানাকারণে প্রচুর কচ্ছপ মারা পড়ে মহানন্দা ডেল্টা থেকে গহীরমাথা এই বেল্টটায়। অনেকসময় জেলেদের জালে লেগে যায়, জালটা বাঁচাতে কচ্ছপগুলোকে ওরা মেরে ফেলে। অথচ এইসময় কিন্তু ওই অঞ্চলে চিংড়ি ধরা বারণ, ট্রলার চালানোও বারণ। কিন্তু মানুষতো শুনছে না। তার পেটের তাগিদেই সে জলে নামছে। একশোটা হয়তো ট্রলার নামছে। কটাকে ধরবে? দুটো একটাকে আটকায়, তাতে লাভ তো কিছু নেই। প্রপেলারে ঘা খেয়ে কচ্ছপ মরছে, শেয়াল-কুকুরে ডিম খুঁড়ে তুলে নিয়ে নষ্ট করছে। এমনকী মানুষও ওই ডিম ভেজে খাচ্ছে।

পাশাপাশি শ্রীলঙ্কায় দেখেছি সেখানে রাতে যখন কচ্ছপ ডিম পাড়ছে, স্থানীয় মানুষ ঘুরে ঘুরে ডিম সংগ্রহ করছে। সরকারি- বেসরকারি কিছু

এন.জি.ও. ওখানে আছে। তারা দশ টাকা দরে ডিমটা কিনে নিচ্ছে। একটা কচ্ছপ একশো তিরিশটার মতো ডিম পাড়ে। ফলে একটা কচ্ছপের সব ডিম সংগ্রহ করতে পারলেই একজনের ভালো উপার্জন হয়ে যায়। এইজন্য ডিমগুলো যাতে শেয়াল-কুকুর না নষ্ট করে সেদিকেও সাধারণ মানুষই কড়া নজর রাখে। ওই সংস্থাগুলি ডিমগুলোর হ্যাচিং করে বাচ্চা বার করে সমুদ্রে ছাড়ছে। শ্রীলঙ্কা যে স্কিমটা করেছে সেটা সত্যিই শেখার। সরকারী প্রকল্পের মধ্যে যদি সাধারণ মানুষকে জড়িয়ে নেওয়া যায় তাহলে কাজটা অনেক সহজ হয়। আবার আন্দামানে দেখেছি কচ্ছপ দিনের বেলাতেও ডিম পাড়তে উঠছে কারণ সে জানে জায়গাটা নিরাপদ।

◆আপনিতো নানান ভ্রমণপত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন। ইন্টারনেটে বাংলা ভ্রমণপত্রিকা 'আমাদের ছুটি'-র এই কনসেপ্টটা কিন্তু একেবারে নতুন। একসঙ্গে বেড়ানোর লেখা-ছবি-তথ্য-খবর-বেড়ানোর প্ল্যান এবং আরও নানান ফিচার নিয়ে এমন একটা ওয়েবসাইট কিন্তু বাংলায় আর নেই। কেমন লাগছে 'আমাদের ছুটি'?

☐এখনতো সম্পূর্ণ ধারণা হয়নি কিন্তু যতটুকু দেখলাম তাতে যেটা মনে হচ্ছে যে প্রিন্ট ম্যাগাজিনের থেকে এর স্কোপটা কিন্তু অনেক বেশি। লোকেতো বই পড়া, ম্যাগাজিন পড়া ছেড়ে দিয়েছে, তাও যদি নেটের গ্রুপ দিয়ে ডাউনলোড করে পড়ে, তবু তো পড়বে। এখন যেমন মোবাইলের সুবাদে লোকে গান শুনছে, সেইরকম নেট খুলে যদি একটা লেখাও পড়ে তাহলেও তো খুব ভালো। আস্তে আস্তে মানুষের কিন্তু এই প্রবণতাটা বাড়বে। এছাড়া এখানে লেখা অ্যাডিশন-অল্টারেশন করার স্কোপটা আছে। পড়ে তখনি যা মনে হল সেই মতামত জানানোর সুযোগ আছে। প্রিন্টে অনেকসময় ছবি ছাপাতে গিয়ে এমন ডিসটর্শন হয় যে ছবিটা চেনা যায় না, এখানে সেই অসুবিধাগুলো নেই। ছবিগুলোকে গ্যালারির মতো সাজিয়ে রাখলে চট করে দেখে নেওয়াটাও সুবিধার। সব মিলিয়ে প্রয়াসটা সত্যিই খুব ভালো।

ডোংরা বীচ, শ্রীলঙ্কা

www.amaderchhuti.com

◆এরপরে আবার কোথায় যাচ্ছেন?

☐এবারেও লাদাখ। জুলাই মাসে লাদাখের জাঁসকর ও পাদর ভ্যালি ট্রেক করতে বেড়িয়ে পড়ব।

সাক্ষাৎকার - দময়ন্তী দাশগুপ্ত

Rate This : - select -
Total Votes : 3
Average : 3.67

Like 41 people like this. Sign Up to see what your friends like.

tell a Friend

Post Comments

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

দু'চাকায় বাংলা - তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ যাত্রার ডায়েরি

মহম্মদ মহিউদ্দিন

স্বপ্নটা অনেক দিন ধরেই মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল। সময়-সুযোগ পেতেই বেরিয়ে পড়লাম তেঁতুলিয়া-টেকনাফ অভিযানে - সাইকেলে সারা বাংলাদেশ ঘোরার স্বপ্নপূরণের প্রথম পদক্ষেপ।
হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত। অত তাড়াহুড়োয় বড় কোন ক্লাবের সহায়তা পাইনি বটে, তবে পুরো অভিযানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নূর মহম্মদ ভাই আমার সাথে থেকে সাহস জুগিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ পরিকল্পনা আর তার সঠিক বাস্তবায়নের পুরো কৃতিত্বই উনারই। শুধু নূর ভাইই নন, কারিগরি সহায়তা আর মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন সেইফ-এর সহকর্মীরা। লম্বা সফরের জন্য ভালো একটি সাইকেলও প্রয়োজন। রাসেল ভাই উনার নতুন সাইকেলটা নিয়ে হাজির হলেন। পকেটমানি ধরিয়ে দিলেন বাবুল ভাই, নূর ভাই, শামীম ও নাসিমা আপু। ছয় রাত থাকার ব্যবস্থাও হয়ে গেল নানাজায়গায়। একা একা এতটা পথ সাইকেলে চড়ে যাব, সবার চিন্তা শুধু এটাই। শামীম আর নূর ভাই বললেন, দু-তিনঘন্টা পরপরই আমার খোঁজখবর নিবেন। সবার শুভেচ্ছা নিয়ে অবশেষে বেরিয়ে পড়লাম অজানা পথে - একা একা এই প্রথম।

২১ অক্টোবর, ২০১১

বিকাল ছয়টায় বাস ছাড়ল গাবতলী থেকে। সাইকেলটা বাসের ছাদে ভাল মত বেঁধে দিয়ে এই অন্যরকম যাত্রায় আমাকে বিদায় জানালেন নূর ভাই।

২২ অক্টোবর, ২০১১

সকাল ৫:৩০ মিনিটে বাস পৌঁছালো তেঁতুলিয়ায়। আমার যাত্রা শুরু হবে বাংলাবান্দার জিরো পয়েন্ট থেকে - তেঁতুলিয়া থেকে ১৭ কিলোমিটার ভেতরে। ছয়টায় রওনা দিলাম। রাস্তাটি অসাধারণ। খুব ঠাণ্ডা। হাতের বাঁদিকে মহানন্দা নদী বয়ে যাচ্ছে তার ঐ পাড়েই ভারত। দূরে পাহাড়ের গায়ে দেখা যাচ্ছে শিলিগুড়ির ঘর-বাড়ি। তার পেছনে কাঞ্চনজঙ্ঘা। সাদা পাহাড় এই প্রথম দেখলাম, একমুহূর্ত মনে হল ওখানে চলে যাই। এসব ভাবতে ভাবতেই বিজিবি ক্যাম্পে থামতে হল। কোন প্রশ্ন করার আগেই এক বিজিবি সৈনিককে আমার পরিচয় দিলাম। ৬:৩০ আর ৯:৩০ এর দিকে গার্ড যাবে জিরো পয়েন্টের দিকে। একা আমাকে যেতে দেওয়াটা বিপদের, যদি আমি ভারতের ভিতর ভুল করে চলে যাই। তবু কী মনে করে সে আমাকে যেতে দিল। বাংলাবান্দা জিরো পয়েন্ট। ছবি তুললাম, মিটার সেট করলাম।

ঠিক ৭:০০ টায় শুরু হল আমার তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ সফর। ২কিমি পর ক্যাম্প অতিক্রম করে চলে এলাম তেঁতুলিয়ার জিরো পয়েন্টে। এখান থেকে আমার আসল যাত্রা শুরু। তেঁতুলিয়া বাজার থেকে সকালের নাস্তা সেরে রওয়ানা হয়ে গেলাম পঞ্চগড়ের দিকে। ৩ ঘন্টা ২২ মিনিট খুব সুন্দর রাস্তা ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় অতিক্রম করে পঞ্চগড় শহরে পৌঁছোলাম তখন আমার মিটার বলছে ৫৭ কিমি হয়েছে। আমার প্রথম দিনের ঠিকানা হল দিনাজপুর, চিরিরবন্দর বাসুদেবপুর গ্রামে যেখানে আমার খুব কাছের বন্ধু বাতেনের বাড়ি। আঙ্কেল আন্টি থাকেন সেখানে, বন্ধু থাকে ঢাকায়। ঠাকুর গা পৌঁছাতেই দুপুর হয়ে গেল। সেখানেই দই, ডিম, পরোটা দিয়ে পেট পুজো করে নিলাম। ১০৬ কিমি হয়ে গেল ঠাকুর গা জেলা অতিক্রম করতে করতেই। আরও অনেকটা পথ বাকি। দেশের এই ভাগটাতে প্রায় সবারই সাইকেল রয়েছে। আর তাঁদের অনেকেই সঙ্গী হলেন প্রায় সারা পথ ধরেই। তাই আসলে একা হয়েও একলা ছিলাম না আমি। যেখানে নাস্তা বা পানি পান করার জন্য থামতাম সেখানে কৌতুহলী পথচারীরা আমাকে ঘিরে ধরতেন আর কেন এই পথযাত্রা তা জানতে চাইতেন। কেউ কেউ আবার পথ আটকে দিতেন কুশল বিনিময় করতে। এভাবেই ১৭১ কিমি অতিক্রম করে সন্ধ্যার দিকে পৌঁছোলাম বন্ধুর বাসায়। ফ্রেশ হয়ে হাত পা ম্যাসাজ করে ভরপেট খাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পরলাম।

২৩ অক্টোবর, ২০১১

সকালের নাস্তা খাইয়ে বিদায় জানালেন আন্টি আর আঙ্কেল। সহজ একটি পথ দেখিয়ে দিয়ে আমাকে সাহায্যও করলেন। বাসুদেবপুর, দিনাজপুর শহর থেকে ১৭ কিমি ভেতরে। গ্রামের ভেতর দিয়ে কুতুবডাঙ্গা ও উচিৎপুর হয়ে বগুরা যাবার রাস্তায় উঠলাম। সকাল ৮:৩০ মিনিটে যাত্রা শুরু করে ১১:২৬ এ বিরামপুর পৌঁছলাম। রাস্তার দুইপাশে হেমন্তের মাঠে মাঠে সোনার ধান ভরে আছে। কেউ কেউ আবার ধান কেটে ঘরে তুলছেন। খুবই সুন্দর মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে বিরামপুর পার হয়ে গোবিন্দগঞ্জ পৌঁছলাম প্রায় ৩টার দিকে। এখানে সাইকেলের মিটারে একটু সমস্যা ধরা পরেছিল। আসলে ব্যাটারি লুজ কানেকশন হওয়াতে বিরামপুরে ৬০ কিমি বেশি রিড করেছিল আর গোবিন্দগঞ্জে এসে মিটার বন্ধই হয়ে গেছে। তবে ভাগ্য ভাল, কারণ সবসময় আমি মিটার সহ কোথায় এলাম তার ছবি তুলে রাখতাম এবং লগ বুক মেনটেইন করতাম। সেই ক্ষেত্রে গোবিন্দগঞ্জে ৩২৭ কিমি ছিল তার থেকে ৬০ কিমি বাদ দিয়ে তেঁতুলিয়ার বাংলাবান্দা থেকে গোবিন্দগঞ্জ হল ২৬৭ কিমি। তাই গোবিন্দগঞ্জ থেকে টেকনাফ যা হবে তার সাথে ২৬৭ কিমি যোগ করলেই মোট দূরত্ব পাওয়া যাবে। আজ মোটামোটি ৯৬ কিমি চলে এলাম। আরো ৪০ কিমি বাকি বগুড়া পৌঁছোতে। আজ রাত্রি থাকার জায়গা হল বগুড়ায়, আকরাম ভাইয়ের বাসায়।
ফেসবুকেই আলাপ আকরাম ভাইয়ার সাথে। প্রথম দেখায় খুবই আপন করে নিলেন আমাকে। করতোয়া নদীর উপরে ছোট একটি ব্রীজ পার হয়ে বিকাল ৪.৫০ মিনিটে বগুড়া শহরে প্রবেশ করার পথে দেখতে পেলাম সাইনবোর্ডে ডানে ১ কিমি ভিতরে বেহুলার গড়। এত কাছে চলে এসেছি তাই মিস করতে ইচ্ছে করল না। একটু ঘুরে এলাম সেখান থেকে। ঠিক ৬ টার দিকে নিমতলা, কৈগাড়ি রোডে আকরাম ভাইর বাসায় এসে পৌঁছোলাম। আজ চালালাম ১৩৭ কিমি। ক্লান্তি তেমন একটা ছিল না তবে বরাবরের মতোই পা একটু ব্যথা ছিল। ফ্রেশ হয়ে একটু ম্যাসাজ করায় পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেলাম। ফ্রেশ হয়ে এসেই দেখি আমার জন্য অনেক নাস্তা রেডি। নাস্তা সাবাড় করে একটু রেস্ট নিয়ে ৯ টায় চলে গেলাম আকরাম ভাইর অফিসে। সেখানে একটি পার্টি ছিল বলে রাতের খাবারটা ওখানেই জুটল। তাদের সবার অনেক বাহবা কুড়ালাম আমার এই ট্যুর নিয়ে। পরিশ্রান্ত হওয়াতে বিছানায় পরতেই ঘুমিয়ে গেলাম।

২৪ অক্টোবর, ২০১১

সকাল ৬ টায় এলার্ম বাজল। বিছানা ছেড়ে রেডি হলাম নতুন একটি দিন নতুন পথ নতুন গন্তব্যের দিকে। আজ যাব ঢাকায়, আমার বাসায়। প্রায় ২১৩ কিমি। তাই ৭ টায় তড়িঘড়ি করে নেমে পড়ি পথে। কুয়াশায় ঢেকে আছে সব আর আমি সাইকেল নিয়ে ছুটলাম কুয়াশা চিরে। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই চলে এলাম শেরপুর।

সেখানে দেখতে পেলাম একটি ফলক যেখানে লিখা "নিরাপদ সড়ক চাই" আর

"দূরকে নিকট করে সড়ক,
মানুষে মানুষে সেতু বন্ধন ঘটায় সড়ক,
মানুষকে তার আশার সীমান্তে পৌঁছে দেয় সড়ক।
সেই সড়ক যাত্রায় তবে কেন দুর্ঘটনা মৃত্যু,
আপনার সড়ক যাত্রা নিরাপদ করুন।
এ দায়িত্ব আপনার আমার সকলের।"

আর লেখা ছিল এই স্থানে যাঁরা সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের নাম।
সেখানে কিছু সময় কাটিয়ে চললাম আমার পথ ধরে। ৯.৩০-য় প্রায় ৪০ কিমি চালিয়ে পেলাম ফুড ভেলি হাইওয়ে রেস্টুরেন্ট। সেখানে দই, পরটা দিয়ে নাস্তা সারলাম। ১১.৫৪- বঙ্গবন্ধু সেতু পৌঁছালাম। টোল ঘরে এসে থামতে হল। এই সেতু দিয়ে সাইকেল চলাচল নিষিদ্ধ। কি আর করা যাবে তারা আমাকে একটি ট্রাকের উপর তুলে দিলেন। সেতুটি এভাবেই পার হতে হল। সেতু পার হয়ে দেখলাম ১২.২০ বেজে গেছে, পথ বাকি প্রায় ১২৬ কিমি। তাই সময় নষ্ট করা যাবে না। এই পথটুকু খুবই ভাল ছিল তাই দ্রুতই চলতে পারলাম। টাঙ্গাইল ডানে রেখে বাঁয়ের পথে চলছি। কিছু দূরে যেতে চায়ের দোকান পেলাম। সেখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে চাপকলের পানিতে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। পরে দুধ দিয়ে একটি বন খেয়ে নিলাম। আসলে পুরো যাত্রায় যখন যা পাচ্ছি তাই খাচ্ছি। কখনো ভরা পেটে এগোচ্ছি না। দেখতে দেখতে মির্জাপুর চলে এলাম। কিন্তু সময় হাতে খুবই কম। টাঙ্গাইল-এর কিছুপর রাস্তা অনেকটাই খারাপ হওয়াতে সময় অপচয় হয়েছে। খুবই ধীরে চলতে হয়। যাইহোক ঢাকায় ঢুকার দুইটা রাস্তার সামনে এসে পড়লাম। সোজা গেলে গীজাপুরের রাস্তা। এটা একটু খারাপ হওয়ায় ডানের পথ ধরলাম। একটু চলতে পরিচিত নন্দন পার্ক গেলাম। ভাবলাম ঢাকায় চলে এসেছি। কিন্তু পথ যে অনেক বাকি তা বুঝলাম একটু দেরিতে। গাড়িতে করে নন্দন যাওয়া আসা করেছি অনেক বার তাই ভাবতেও পারিনি এই পথ এত বড় হবে। আশুলিয়া পার হয়ে বেড়িবাধের রাস্তায় ঢুকতেই অন্ধকার হয়ে গেল। অনবরত ঘাসপোকা চোখে এসে লাগছে। যন্ত্রণাও শুরু হল। পথ চলতে অনেক কষ্ট হচ্ছিল। টর্চটা ব্যাগ থেকে বের করে চলতে লাগলাম আল্লাহর নাম নিয়ে। হাহ্ মিরপুর চলে এলাম। ঢাকায় পৌঁছালাম ৭ টায়। একটু স্বস্তি ফিরে পেলাম।
ঢাকায় জ্যাম আমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানালো আর নুর ভাই শাহবাগে। ৭:৩০ টায় তার সাথে কিছু সময় কাটিয়ে চলে এলাম বাসায় বেড়াতে। নিজের বাসায় বেড়াতে এই প্রথম এলাম। যাক গোসল করে কাপড় চোপড় নতুন করে ব্যাগে নিয়ে ঘুমিয়ে পরলাম। নিজ বাসা তার উপর মায়ের আদর, খুব ভালই ঘুম হল।

২৫ অক্টোবর, ২০১১
এত আরামে একটু দেরিই হয়ে গেল উঠতে। ২৫শের যাত্রা শুরু হল সকাল ১০ টায়। আজ সীমান্ত চৌদ্দগ্রাম মেঝভাবীর বাপের বাড়ি অবধি যাব। ঢাকা ছেড়ে কাচপুর, মেঘনা ও দাউদকান্দি ব্রীজ পার হয়ে গৌরীপুর চলে এলাম ১২: ৪৫ মিনিটেই। হালকা কিছু নাস্তা সেরে আবার চলা শুরু করলাম। বিগত দিনগুলো আকাশে প্রচুর মেঘ ছিল বলে খুব আরামেই চলছিলাম। ঢাকার দক্ষিণে আসতেই রোদের দেখা পেলাম তাই অনেক কষ্ট হচ্ছিল। কষ্ট ছাপিয়ে ময়নামতি পার হলাম ৩:৪৫ মিনিটে। সেখানে ছবি তুলতে যেতে, এক আর্মি আমাকে থামিয়ে দিয়ে ছবি তোলার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমার উদ্দেশ্য ও যাত্রার কথা শুনে উনার চোখ কপালে উঠল। বললেন, একি সম্ভব! সম্ভব কিনা তার প্রমাণ হিসেবে উনার সামনেই হাজির ছিলাম আমি।
ময়নামতি পার হয়ে চলে এলাম চান্দিনা। সেখানে পেটে খুব টান পরায় খেয়ে নিলাম দুপুরের খাবার। এখনও পর্যন্ত ঢাকা হতে ৭৬ কিমি চলে এসেছি আরও ৬০ কিমি বেশি পথ বাকি। খুব রোদ ছিল, বার বার গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। পানি, স্যালাইন খেয়ে নিচ্ছি একটু পর পরই। পথ টুকুও যেন আরও বড় মনে হচ্ছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল হাইওয়ে রোডে। লাইট বের করে পথ চলছি। আবার কয়েকটি ঘাসপোকা চোখে ঢুকে খুবই বিরক্ত করছে। যাক ৬ টার দিকে পৌঁছে গেলাম মেজু ভাইর শ্বশুর বাড়ি। সরবতের সাথে অনেক নাস্তা দিয়ে আপ্যায়ন করল আমাকে। রাতে মাছ, মাংস ও পোলাও-কোরমা - বিশাল আয়োজনে ভুরিভোজ হল। আজ মোট চললাম ১৩৯ কিমি। রাতে ঘুমিয়ে পরলাম ঝিঁঝিঁপোকার ডাক শুনতে শুনতে।
২৬ অক্টোবর, ২০১১
শীতের ভাব গ্রামে মোটামুটি চলে এসেছে তাই সকালে নাস্তা হল ভাপা ও পুলি পিঠা দিয়ে। নাস্তা সেরেই ৭টা ৫০ মিনিটে বেরিয়ে পরলাম চিটাগাংয়ের উদ্দেশে। দেখতে দেখতে ৮:৪০ মিনিটেই ফেনী চলে এলাম। শহরের রাস্তায় না ঢুকে সোজা পথ ধরে চললাম। আজ রোদ খুবই প্রকট ছিল তাই পানি পিপাসা একটু বেশি পাচ্ছিল। যাই হোক চলতে চলতে হাতের বাম পাশে ফেনী নদী পার হয়ে কিছু দূর যেতেই দেখা গেল ছোট ছোট পাহাড়। বুঝতে অসুবিধা হল না সীতাকুণ্ড বেশি দূরে নয়। পাহাড়ের প্রতি দুর্বলতা আছে অনেক আগে থেকেই। এখনো যেন চন্দ্রনাথ পাহাড় ডাকছিল বার বার। কিন্তু তার ডাকে সারা না দিয়ে সীতাকুণ্ড অতিক্রম করে চলে এলাম। সাড়ে ১২টা বাজে। মিটারে তখন ৪৫৯ কিমি। চিটাগাং আর বেশি দূরে নয় তাই একটু ধীরে ধীরেই চলছি। আজ একটু কষ্টই হচ্ছিল। চিটাগাং প্রবেশের সিটি গেটটি দেখা গেল ২টা ১০ মিনিটে। সেখান থেকে সুজা ভাইকে ফোন করে দিলাম। তাঁর বাড়ির লোকেশন জানালে খুব অল্প সময়ই চলে গেলাম কৈবল্যধাম মন্দিরের সামনে। সিটি গেট থেকে ২-১ কিমি পথ। মিটার বলছে মোট ৪৯৩ কিমি হল। অর্থাৎ আজ চললাম প্রায় ১০৯ কিমি, সময় লাগল ৬ ঘন্টা। দুপুরের খাবার খেয়ে সুজা ভাইয়ের বাসায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। বিকালে গেলাম পাড়া বেড়াতে। কালীপুজোর জন্য কৈবল্যধাম মন্দির এলাকা একেবারে জমজমাট। খুবই আনন্দঘন পরিবেশ।

২৭ অক্টোবর, ২০১১
সকাল- সকালই ঘুম ভাঙ্গলো। আজকের লক্ষ্য কক্সবাজার। ৭:৩০টায় চাকা ঘুরতে শুরু করল। কৈবল্য ধাম থেকে নতুন ব্রীজ যাবার খুব সহজ রাস্তা বলে দিলেন সুজা ভাই। রাস্তাটি অসাধারণ সুন্দর। চিটাগাং শহরের ভিতর পাহাড়ের মাঝ দিয়ে চলে গেছে। পাহাড়ি জঙ্গল দুপাশে, আবার সেই জঙ্গলে রয়েল বেঙ্গল টাইগারও দেখা গেল। সত্যি, সেগুলো টাইগারই ছিল, তবে কৃত্রিম! একটি দোতলা রাস্তাও পেলাম পাহাড়ের গা ঘেঁষে। ভালই লাগল।এই পাহাড়ি রাস্তাই ঢাকার থেকে চিটাগাংকে একটু আলাদা করে রেখেছে - নয়তো পরিবেশ, দালান কোঠা সব অনেকটা ঢাকার মতোই। ১৬ কিমি পথ অতিক্রম করতে হল নতুন ব্রীজের দেখা পেতে। বাসে করে যাওয়ার সময় অনেকবার দেখেছি এই ব্রীজটি। সত্যিই খুব সুন্দর। ব্রীজে কিছু ছবি তুলে আবার ছুটলাম আমার পথে। পথ আজ ১৬০ কিমি-র। এই রাস্তায় অনেকবার বাসে করে গিয়েছি কিন্তু তারপরও অচেনা লাগছে, সব কিছু নতুন মনে হচ্ছে। কারণ যতবারই যাওয়া হয় সেটা রাতে আর ঘুমিয়েই পার হয়ে যাই পুরো যাত্রা। কিন্তু এখন আমি সাইকেলে তাই ঘুম তো দূরে থাক চোখ খুলে অনেক সতর্কভাবে চলতে হচ্ছে - প্রচুর গাড়ি এই রাস্তায়। ১১১ কিমি বাকি বলছে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মাইল ফলক। ঘড়িতে তখন ১০:৩৬ মিনিট। ৩ ঘন্টায় চালিয়ে ৫২ কিমি চলে এলাম। কানার হাট পার হলাম, তার কিছু পরে পাদুয়া। এর পরেই শুরু হল বনাঞ্চলে ঘেরা পথ। রাস্তার পাশে দেখা পেলাম চুনতি অভয়ারণ্যের। পশু পাখিরা এখানে নির্ভয়ে চরে বেড়ায়। ৯৩ কিমি চালিয়ে পৌঁছালাম ইনানী রিসর্ট-এ। কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে হালকা নাস্তা করে নিলাম ঘড়িতে তখন প্রায় ১টা বাজে। রাস্তা এখনও অনেক বাকি। তাই খুব বেশী সময় বিশ্রাম নেয়া যাবে না। দুই পাশে ঘন ঘন বিশাল বিশাল গাছ সারি বেঁধে দাড়িয়ে আছে। রাস্তার লেখা দেখে চোখ অধীর আশায় এদিক ওদিক খুঁজে বেড়াচ্ছিল বুনোহাতি। কিন্তু কোন কিছুই দেখতে পেলাম না। তবে একটি উপকার হয়েছে। খোঁজার তালে তালে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে চলে এলাম কক্সবাজারের কাছে। 'স্বাগতম কক্সবাজার' লেখা একটি সাইন বোর্ডের কাছে পৌঁছালাম বিকাল ৪.১৫ মিঃ। ১৪৩ কিমি চলেছি মিটার বলছে। এত কাছে এসে পথ যেন আর শেষ হচ্ছে না। ৫.০০ টা পৌঁছালাম কলাতলী বিচ-এ। অনেক দিনের সখ ছিল কক্সবাজারের এই এলাকাটায় সাইকেলে চলতে। আজ পূরণ হল। সন্ধ্যার সূর্য তখনও আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। তবে বেশিক্ষণ সেখানে থাকলাম না কারণ আজ হোটেলে থাকতে হবে, তার খোঁজে চললাম। লংবিচ হোটেলের কাছাকাছি আসতেই আমার মত কিছু সাইকেল আরোহী দেখতে পেলাম। অরুনাভ ও তার দল। মাথার হেলমেট দেখেই বুঝতে পেলাম আমার দলের লোক তারা। মানে তারাও সাইকেল প্রেমী।

অরুনাভর সাথেও পরিচয় ফেসবুকেই। কুশল বিনিময়ের পর আমি তখনও কোন হোটেল বুক করিনি জানতে পেরে জোর করেই যেখানে উনারা উঠেছিলেন সেই সী-সান হোটেলে নিয়ে গেলেন। আমাকে কোন কথা না বলতে দিয়ে সোজা একটি রুমে ঢুকিয়ে দিলেন। পরে রাতে খাবার শেষে উনাদের সাথে কিছু গল্প করে ঘুমাতে গেলাম। এসি রুমে একটু বেশি আরামের ঘুম হল।

২৮ অক্টোবর, ২০১১
সকাল ৬.৩০ এ ঘুম ভাঙ্গলো। রেডি হয়ে অরুনাভদের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম টেকনাফের উদ্দেশ্যে। সকালের নাস্তা সেরে রওয়ানা হতে হতে ৭.৪৭ বেজে গেল। আজকের ডেস্টিনেশন টেকনাফ খুব বেশি পথ না। আর বড় কথা হচ্ছে এটা আমার পরিচিত পথ। জুন মাসে সেইফ এর ৫ জন সাইকেল আরোহীর সাথে এ পথ পাড়ি দিয়েছিলাম। সে পথে আজ আমি একা চলছি। সেই মেরিন ড্রাইভ.. অনেক স্মৃতি..। ২০০৭ সালে এই রাস্তাতেই ৪২.০২ কিমি বাংলা ম্যারাথন কমপ্লিট করেছিলাম। তাছাড়াও আর তিন বার ম্যারাথন অর্গানাইজ করেছিলাম। পরিচিত পথ চলতে খারাপ লাগছিল না। এক পাশে সাগর, আরেক পাশে সারি সারি পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে ছুটে চলেছি আপন মনে। হিমছড়ি - ইনানী বিচ পার হয়ে শাপলাপুরের কাছেই একটি ব্রীজ, সাগরের খুবই কাছে। সেখানে দাঁড়িয়ে কয়েকটি ছবি তুলে রওনা হলাম। ৯৬৫ কিমি হয়ে গেল আরও ২৯ কিমি বাকি। এই পথটুকু অনেক সুন্দর, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শাপলাপুর পেরোলাম ১০.৩০ মিনিটে। পাহাড়ি পথ পাড়ি দিতে হল কিছু, আবার কিছুটা পথ গাছের ফাঁকে ফাঁকে। নোয়াখালীর নাহার ছড়ার পথে হালকা নাস্তা করে কৌতুহলী মানুষের সাথে কথা বললাম কিছুক্ষণ। আবার পথ চলা। তবে দেখতে দেখতে পথে দুরত্ব কমে এল। আর মাত্র ৫ কিমি - ৪ কিমি - ৩ কিমি - ২ কিমি - ১ কিমি - অবশেষে ০ কিমি টেকনাফ। উফফ্.. দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিলাম। নিজেকে বললাম - হ্যাঁ আমি পেরেছি। ঘড়িতে সময় ১২.২৮ মিনিট। মিটার বলছে ৭৩২ কিমি। সব মিলিয়ে বাংলা বান্ধা থেকে টেকনাফ ৯৯৯ কিমি হল আমার মোট দুরত্ব। সাড়ে ৬ দিনে, মোট ৬০ ঘন্টা ৪১ মিনিট বিশ্রামের সময় সহ সাইকেল চালাতে হয়েছে। আমার জানা মত এখনো পর্যন্ত এই পথে এটাই দ্রুততম অভিযান।
মোবাইলটা হাতে নিলাম। এই অভিযানে যাঁরা আমার পাশে ছিলেন আমার মা, নূর ভাই, সেইফ-এর সহকর্মীরা, আরও সবাই, তাঁদের কথাই শুধু মনে পড়ছিল বারবার। স্বপপূরণের এই খুশীর খবর এবার সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে তো!

মাউন্টেনিয়ারিং আর নানান অ্যাডভেঞ্চারের নেশাটা ছেলেবেলা থেকেই। 'এক্সপ্লোর বাংলাদেশ' ট্যুরিজম সংস্থার ট্রাভেল এক্সিকিউটিভ মহি-র স্বপ্ন সাইকেলে সারা বাংলাদেশ ভ্রমণ।

tell a Friend

তরঙ্গ ছুঁয়ে

মানব চক্রবর্তী

~ তথ্য - তামিলনাড়ু কোস্টাল ট্রেক ~ ট্রেক রুট ম্যাপ ~ কোস্টাল ট্রেকের আরো ছবি ~

পয়েন্ট ক্যালিমার থেকে কুড্ডালুরু। এই দু'শো দশ কিলোমিটার পথ, সমুদ্রের পার ধরে চলা। কাঁধে রুকস্যাক্। তাতে আমাদের প্রয়োজনীয় র‍্যাশন। রান্নার সরঞ্জাম, জামাকাপড়, সব। মানে পিঠে চেপে বসা চলমান সংসার।
চলেছি কোস্টাল ট্রেকিংয়ে। ছয় সঙ্গী।
তামিলনাড়ুর নাগাপট্টিনম ডিস্ট্রিক্টের একেবারে শেষ মাথায় দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে সেই স্বপ্নের জায়গাটি। যার নাম পয়েন্ট ক্যালিমার। তামিল ভাষায় বলে কোডিয়াকড়াই। ট্রেনে হাওড়া থেকে চেন্নাই। চেন্নাই থেকে মাদুরাই। মাদুরাই থেকে বাসে গুরুভায়ুর হয়ে ভেদারানিয়ান। এখান থেকে মাত্র বারো কিলোমিটার পয়েন্ট ক্যালিমার।
এবার থেকে শুরু হল মূলপর্ব। বাসে যখন যাচ্ছি, একপাশে ঘন বন। অন্যদিকে অজস্র নুন তৈরির ভেড়ি। অনেকটা মাছের ভেড়ির মত শয়ে-শয়ে পুকুর। সমুদ্রের জল ঢুকিয়ে তা থেকে নুন তৈরি হয়। মাইলের পর মাইল একই ছবি। এই পুকুরগুলিই পরিযায়ী পাখিদের স্বর্গরাজ্য। পয়েন্ট ক্যালিমারের বার্ড স্যাংচুয়ারির খুব নাম। ফ্লেমিংগো, পেলিক্যান ও আর যে কত পরিযায়ী পাখির মেলা বসে যায়!

পয়েন্ট ক্যালিমার

পয়েন্ট ক্যালিমারে একটা বন দপ্তরের বাংলো আছে। দুর্দান্ত। সমুদ্র ও বার্ডস্যাংচুয়ারির পাশে ছবির মত একটা দোতলা বাংলো। প্রশস্ত ঘর। সমুদ্রের উদোম হাওয়া যেন আমাদের শহুরে কালিমা ধুয়েমুছে সাফ করে দেবে।
www.amaderchhuti.com
একদিন থাকব ওখানে। কাল ভোরে বার্ড স্যাংচুয়ারি দেখে পরশুদিন সকালে স্টার্ট হবে আমাদের কোস্টাল ট্রেকিং।
ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে পড়েছি পয়েন্ট ক্যালিমারের বার্ড স্যাংচুয়ারি দেখতে। হিমে ভেজা পথ। গাছগাছালি। টুপটুপ করে শিশির ঝরছে। আর অগভীর জলের অজস্র নোনাপুকুরের মাঝ দিয়ে সে এক মিস্টিক পদযাত্রা। যেন স্বর্গের খিল নাড়তে চলেছি। ধীরে ধীরে সূর্যের আলোয় জলে রংবাহারি খেলা আর মুগ্ধচোখে দেখি পাখির মেলা। চুপ, ক্যামেরা চলছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। পেলিক্যান, ফ্লেমিঙ্গো, আর কত কী! আমি কি ছাই পাখি চিনি? শহরের কংক্রিটের জঙ্গলে বড় হয়েছি আর পৃথিবীর দূরতম প্রান্ত থেকে আসা পরিযায়ী পাখিদের দেখছি। মুগ্ধ। শুধু মনে হচ্ছিল বড় টেলি-লাগানো দামি একটা ক্যামেরা কেন যে আমার নেই!
রাতে বন-বাংলোয় স্বপাক-রন্ধন। স্যাকে সব আছে। স্টোভ, কেরোসিন, চাল-ডাল, আলু, মশলাপাতি এবং বাসন। বিলু, শুভব্রত, সৌমেন আর অজিত চারজন মিলে দারুণ ডিমের ঝোল, ভাত আর একদলা করে আলুরচোখা করল। না, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হল না। পরম তৃপ্তিতে খেলাম। তারপর টিম মিটিং। পরদিন সকাল ছ'টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ব।
সমুদ্রের হাতছানি। ঢেউয়ের গর্জন। অচেনা সৈকত। রাত কেটে গেল। বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের যাত্রা শুরু হল। পয়েন্ট ক্যালিমারের সমুদ্র পারে অনেকগুলো মাছধরা যন্ত্রচালিত নৌকা দুলছে। বা কেউ রাতভর সমুদ্র-সফর সেরে ফিরছে। সূর্য উঠি-উঠি। সৌমেন শুভব্রতরা ছবি তুলল। ফেনিল সমুদ্র ঢেউ আছড়ে পড়ছে। সেই ভেজা বালিতে পা ফেলে ফেলে আমরা এগিয়ে চলেছি।
অজস্র লাল কাঁকড়ার যেন এক অন্তহীন কার্পেট বিছানো। দেখে দেখে আশ মেটে না। মনে হয় পায়ের চাপে মারা পড়বে। কিন্তু ওরা বালিতে কম্পন টের পায় আর সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট গর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। এত ছোট জীব, কিন্তু কি বিরাট লুকোচুরি!
সবার আগে সৌমেন, অজিত আর বিলু। ওদের পেছনেই শুভব্রত। তার পেছনে আমি আর সুব্রত। আমাদের ডানদিকে সমুদ্র। এখান থেকে শ্রীলঙ্কার জাফ্না মাত্র ষোলো কিলোমিটার, সমুদ্রপথে। রাতে আকাশ পরিষ্কার থাকলে জাফ্নার উচু আলোকস্তম্ভ দেখা যায়।
রোদ উঠেছে। বালি গরম হয়ে উঠছে। টানা দু'ঘন্টা হেঁটে বাঁ পাশে অজস্র নারকেল গাছ ঘেরা একটা গ্রামের ছবি অস্পষ্ট দেখা গেল। আমাদের জলের বোতল প্রায় শেষ। ঘাম হচ্ছে খুব। প্রধানত জলের প্রয়োজনেই সমুদ্রতট থেকে আধ কিলোমিটার বাঁ দিকে ঢুকে গ্রামে পৌঁছতেই সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।
আমাদের পরনে চেরি রঙের ট্রাকশ্যুটের লোয়ার আর উজ্জ্বল হলুদ রঙের টিশার্ট, মাথায় চেরি রঙের সুদৃশ্য টুপি। সবার পিঠে কালো-হলুদ রুকস্যাক। সুতরাং ঐ জমকালো পোশাক দেখে গ্রামের মানুষ অবাক বিস্ময়ে ঘিরে ধরল। বাচ্চা বুড়ো ছেলে মেয়ে। ওদের ভাষা বুঝি না। ওরাও আমাদের কথা বোঝে না।
গ্রামের শুরুতেই একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে জল খাবার ভঙ্গি করতেই এক বৃদ্ধা এক হাঁড়ি জল এনে দিলেন। বুঝলাম তৃষ্ণার ভাষা ইউনিভার্সাল। আমার সঙ্গীদের ততক্ষণে নজর পড়েছে গাছে ঝুলে থাকা বড় বড় ডাবের দিকে। কি আশ্চর্য, গ্রামবাসীরা আমাদের মনের ভাষা বুঝে সেই মুহূর্তেই একটা ছেলেকে গাছে উঠতে বলল। ছেলেটা তরতর করে গাছে উঠে অনেকগুলো ডাব নামাল। তারপর দা দিয়ে কেটে

হাতে হাতে ধরিয়ে দিল। আঃ.. ডাবের জল খেয়ে শরীর যখন চাঙ্গা, তখনি একটা মোটরবাইকে চেপে দুজন পুলিশ ইন্সপেক্টর হাজির। শুরু হল প্রশ্ন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। আমরা কারা! কোত্থেকে এবং কেন এসেছি। আমাদের আই-কার্ড এবং পুলিশ কমিশনারেট (আসানসোল-দুর্গাপুর) মহাশয়ের পার্মিশন লেটার দেখালাম। তারপরে ওরা শান্ত হল। তখন একজন অফিসার তার মোবাইলে আমাদের সবার ছবি তুলে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, আপনারা যেতে পারেন।

ঝাউ-এর বনে পথের খোঁজে

ঘন্টা দুয়েক ফের সৈকত ধরে হেঁটে থামতে হল। সামনে খাঁড়ি। জুতো-মোজা, ফুলপ্যান্ট খুলে স্যাক মাথায় নিয়ে অগভীর খাঁড়ি পার হওয়া গেল। ফের শুরু হল পথ চলা। এবারে বাঁদিকে বিস্তীর্ণ ঝাউসারির ছায়ায় একটু বসা। মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি। সূর্য তখন মধ্যগগনে। স্যাক থেকে পলিথিন শিট বার করে ঝাউবনে পেতে সবাই বসলাম। অজিত ছাতুর প্যাকেট বার করে প্রত্যেককে নুন চিনি ও লেবুর রস দিয়ে ছাতুর সরবত করে দিল। সঙ্গে বিস্কুট আর খেজুর। আধ ঘন্টার মধ্যে মধ্যাহ্নভোজ শেষ। পনেরো মিনিট বিশ্রাম। আজ আঠাশ কিলোমিটার দূরবর্তী মল্লারপুরম পৌঁছোতেই হবে।

এবারে ঘন্টা তিনেক একটানা পথচলা। কষ্ট হচ্ছে। পায়ের তলা জ্বালা করছে। কিন্তু আনন্দও কম নয়। মাঝে মাঝে জেলেদের জিজ্ঞাসা করলে ওরা হাতের পাঞ্জা তুলে কি দেখায়। বুঝি না। এক পাঞ্জা মানে কি পাঁচ মাইল? মল্লারপুরম কি আর পাঁচ মাইল?

মাঝে আর একটা খাঁড়ি। তবে এটাতে জল কম। জুতো খুলে পার হয়ে, তখন বিকেল, যে গ্রামে পৌঁছলাম তার নাম পুষ্পভরম। এবং জানলাম, পুষ্পভরমেরই পোশাকি নাম মল্লারপুরম।

গ্রামে ঢুকতেই আবার আমাদের ঘিরে ভীড়। অনেক চেষ্টার পর পঞ্চায়েত প্রধানকে বোঝানো গেল যে আমরা কোস্টাল ট্রেকার। সবার কাছেই প্রশাসনের বৈধ কাগজপত্র আছে। এবার আতিথ্যের পালা। ওরা থাকার জন্য একটা বড় ঘর খুলে নিজেরাই ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে দিল। যাক, নিশ্চিন্ত। ততক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। হঠাৎ গ্রামের একজন ছেলে তার বাড়িতে মাছভাত খাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল। আমরাও তৎক্ষণাৎ রাজি। কারণ তাহলে আর আমাদের রান্নার হ্যাপা পোহাতে হবে না।

কি আন্তরিক ব্যবহার ! থালায় ভাত, চার রকমের সামুদ্রিক মাছ, কাঁকড়া। দেখে চোখ ছানা বড়া। অচেনা মাছ খেয়ে যদি পেট খারাপ হয়? তবু পারলাম না ফেলতে। জিত হল জেলে পরিবারের আন্তরিকতায়। সবাই খেলাম। রাতে গ্রামের অলিগলি হয়ে ফিরে এলাম আস্তানায়।

পুষ্পভরমে সূর্যাস্ত

সত্যি, পুষ্পভরম যা আতিথ্য দিল বলার নয়। ৯-১২-২০১১ তারিখের রাত। রাতে শুয়ে ভাবছিলাম মানুষ কখনো খারাপ হয় না। আমাদের ভুল বোঝাই সম্পর্ক খারাপ করে।

১০-১২-১১ তারিখ সকাল থেকেই ফের পথচলা। এখানকার বালিটাতে পা ঢুকে যাচ্ছে। ফলে চলতে খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু যেতে তো হবেই। স্যাকের ওজনও প্রায় ষোলো কেজি। গড়পড়তায় সবারই স্যাকের ওইরকম ওজন। তার ওপর সমুদ্র সৈকত সবসময়ই একদিকে ঢাল। আজ আমাদের সন্ধের মধ্যে পৌঁছোতে হবে কামেশ্বরপুরম। প্রায় তিরিশ কিলোমিটার।

পথ চলতে চলতে একটা জিনিস বেশ বুঝতে পারছি বিগত সুনামি এই উপকূলের বহু চালচিত্র বদলে দিয়েছে। সমুদ্র-সন্নিকটে যে সব গ্রাম ছিল সুনামির বিধ্বস্ততার কারণে তা দূরে চলে গেছে। সমুদ্র ধার ঘেঁষে অজস্র বনাঞ্চল প্রায় মুছে গেছে। নতুন করে বেড়ে ওঠা ঝাউয়ের সারি যেন সেই কথাটাই বলে দেয়। পুষ্পভরমে দেখেছি গোটা গ্রামটাতেই প্রায় দু'ফুট বালির আস্তরণ। এ সবই প্রলয়ঙ্কর সুনামির অবদান। ওই গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি তাদের গ্রামের আটষট্টি জন মানুষ সুনামির তান্ডবে মারা যায়।

যাক, পুষ্পভরম পেরিয়ে অনেকদূর চলে এসেছি। একটা খাঁড়ি পার হতে হল। ভিল্লাপালম নামে একটা গ্রামের কাছে এসে দুপুরের খাওয়া সারব। রোদ্দুরে বালি তেতে উঠছে। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের নিচে জ্বালা-জ্বালা করছে।

সঙ্গী বদু বলল, ওখানে ফোস্কা পড়বে। রাতেই লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে নিয়ো।

আমাদের প্রত্যেকের কাছেই লিউকোপ্লাস্ট আছে। কারণ কোস্টাল ট্রেকিংয়ের এটা একটা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। দীর্ঘ পথচলায় পায়ে ফোস্কা। যাই হোক দুপুরে একটা ঘন বাবলাগাছের অল্প ছায়ায় লাঞ্চ ও বিশ্রাম। অজিত আর বিলু ছাতুর সরবত তৈরি করতে লেগে গেল। আমসত্ত্ব, খেজুর, কয়েকদানা করে কাজুবাদাম, কিসমিস সেই সঙ্গে বিস্কুট - এই হল লাঞ্চ।

তারপরই পিঠে স্যাক তুলে চলা শুরু।

সন্ধের আগে ক্লান্ত শরীরে পৌঁছলাম কামেশ্বরপুরম গাঁয়ে। প্রচুর মানুষ ঘিরে ধরল। তাদের নানা প্রশ্ন। নানা সংশয়। আমরা শুধু মিটমিট হাসছি। গ্রামস্থ একটা চায়ের দোকানে বসেই সেন্টু বড়া-র অর্ডার দিল। বড় সাইজের দুটো করে পেঁয়াজ আর ডাল দিয়ে তৈরি বড়া। সেইসঙ্গে চা।

ততক্ষণে গ্রামের পঞ্চায়েত হাজির। আমাদের সুবিধেই হল। তাঁকে সব বুঝিয়ে বললাম। রাতে আমাদের আশ্রয় চাই। উনি আমাদের সব কাগজপত্র দেখে রাজি হলেন। একটা স্কুলঘর, ছোট্ট বরাদ্দ হল। আমরা যেতেই সেই নাইটস্কুল, গোটাকুড়ি বাচ্চা ছেলেমেয়ে পড়ছিল, মাস্টার ছুটি দিয়ে দিল। সামনে ছোট একটা পুকুর। পাশেই টিউবকল। আমাদের জন্য আদর্শ জায়গা।

রাতে অজিত আর বিলু আলু-সয়াবীনের তরকারি, ঘন মুসুর ডাল আর ভাত করল। খেয়ে দেয়েই ঘুমের দেশে।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই বুড়ো আঙ্গুলের নিচে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে নিলাম। দেখি অজিত আর বদুও লাগাচ্ছে। তারপরই দ্রুত বেরিয়ে পড়া। সমুদ্রের পার ধরে হেঁটে চলছি।

এই দীর্ঘ পদযাত্রাকালীন মাঝে মাঝে একঘেয়েমি গ্রাস করে। রাত্রিদিন অন্তহীন ঢেউ আর তটরেখা, যতদূর দৃষ্টি যায় নীল জল, মাথার ওপর নীল আকাশ। তখন একঘেয়েমি কাটাতে মনে মনে ভাবি প্রকৃতির তুলনায় আমরা কত তুচ্ছ! কত সামান্য! কত ক্ষুদ্র! অথচ আমাদের অহং

www.amaderchhuti.com

তবু যায় না। এই কোস্টাল ট্রেকিং সেটা যেন হাতে-কলমে বুঝিয়ে দিল। স্বামী বিবেকানন্দ সারা ভারত প্রদক্ষিণ করেছিলেন। ভারতের আত্মাকে অনুভব করতে। আমরা তো মাত্র দুশো দশ কিলোমিটার হাঁটব। এটা ভাবতেই ভেতরটা চাঙ্গা হয়ে উঠল।

সৌমেন, অজিত অনেকটা এগিয়ে গেছে। আমরা সামান্য পিছিয়ে। আজ একটা খুব বিখ্যাত চার্চ পড়বে পথে। ভেলাংগিনি। এই চার্চ ভেলাংগিনি সমুদ্রসৈকত দেখতে বহু দূরদেশ থেকে মানুষ আসে।

ভেলাংগিনি চার্চ

সাড়ে এগারোটা অবধি হেঁটে ভেলাংগিনি পৌঁছোলাম। সমুদ্রের ধার থেকে শ্বেতপাথরের চূড়া আর অপূর্ব গথিকশৈলী দেখেই বুঝলাম ভেলাংগিনি চার্চ যে অতি বিখ্যাত একটা জায়গায় তা মিথ্যে নয়।

অজস্র মানুষ সমুদ্রতীরের বোল্ডারে বসে আছে। কেউ খাচ্ছে। কেউ গল্প করছে। অতি উৎসাহী কেউ বা জলে সাঁতার কাটছে। অনেকটা আমাদের দীঘার মত।

আমরা স্যাক কাঁধে চললাম ভেলাংগিনি চার্চ দেখতে। সত্যি, চোখ জুড়িয়ে যায়। কী অপূর্ব শৈলী! তবে কিনা মানুষের প্রচন্ড ভীড়। গিজগিজ করছে। হবে নাই বা কেন? খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের কাছে এ অতি পবিত্র তীর্থ।

ঘন্টাখানেক দেখে বেরিয়ে এলাম। সারি সারি দোকান। মাছভাজা খেতে খুব ইচ্ছে হল। আমাদের ক্যাপ্টেন বিলু দু'তিন রকম মাছভাজার অর্ডার দিল। সবই অচেনা মাছ। কিন্তু খেলাম খুব স্বাদে। তারপর ফের হাঁটা। আজ আমাদের টার্গেট নাগাপট্টিনম।

ভেলাংগিনি পেরিয়ে পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে একটা শাখানদীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। নদীটা সমুদ্রে মিশেছে। জল অনেক। একজন জেলের কাছে শুনলাম এটা নৌকো ছাড়া পেরুনো সম্ভব নয়। নৌকো পাই কোথায়? ধারে কাছে তো নৌকো দেখা যাচ্ছে না একটাও। আধঘন্টা দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় দূরে ঐ শাখানদীতে একটা নৌকো দেখে সৌমেন অজিত হাত নেড়ে চিৎকার করতে লাগল, হেল্প...হেল্প...হেল্প...।

ভাগ্য ভালো বলতে হবে। ওদের চিৎকারে মাঝির নজর কাড়ল। সে নৌকো নিয়ে আমাদের কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। মোটর বসানো মাছ ধরার নৌকো। ছ'জন চেপে বসলাম। নদী পার করে দিল মাঝি।

সুব্রত বলল, কত টাকা দিতে হবে?

মাঝি হেসে বলল, নো...নো...ফ্রেন্ড...ফ্রেন্ড...

এই হল মানুষ।

আর এই মানুষের স্বরূপ দেখার জন্যই তো বেরিয়ে পড়া। নাগাপট্টিনম এসে যাত্রাবিরতি।

আশ্চর্যজনকভাবে নাগাপট্টিনম থানার সৌজন্যে রাতে একটা ম্যারেজ-হলে থাকার সুযোগ পেয়ে গেলাম। বাথরুম, টয়লেট, চকচকে মেঝে। রাতে রান্না হল ডিমের ঝোল আর ভাত। খেয়েদেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুম।

পরদিন ভোরে ফের সমুদ্রসৈকত ধরে চলা। আজ ১২-১২-১১। দারুণ দিন। ঝকঝকে রোদ। সমুদ্র ঢেউ দু'হাত তুলে হাতছানি দিচ্ছে। পায়ের ফোস্কায় লিকোপ্লাস্ট লাগিয়ে হাঁটছি। কিন্তু মাঝে মাঝে খাঁড়িগুলো বিপত্তি ঘটাচ্ছে। জলে লিকোপ্লাস্ট-এর আঠা নষ্ট হয়ে যায়। উপায় নেই। অবশেষে অনুভব করলাম সব কষ্টই একসময়ে সয়ে যায়, যদি না অন্য কোনও উপায় থাকে।

ঘাড় ঘুরিয়ে সৌমেন আমাকে দেখেই বলল, সাবাশ। আপনার সত্যি দারুন স্ট্যামিনা। এই বয়সেও এমন তাল মিলিয়ে হাঁটছেন।

সৌমেনের কথাটা মনের জোর অনেকটা বাড়িয়ে দিল। আসলে নিজে সৌমেন খুব ভালো ট্রেকার। মনটাও চওড়া। তাই ও এমন করে উৎসাহ দিতে পারে।

পাশে চলা বদুকে জিজ্ঞাসা করলাম, আজ কোথায় আমাদের রাত্রিবাস হবে?

- সম্ভবত তরঙ্গমবাড়ি।

নামটা শুনেই মন আনন্দে নেচে উঠল। সমুদ্রতীরে 'তরঙ্গমবাড়ি'। নামটা অর্থবহ শুধু নয় দারুণ লিরিক্যাল।

গতরাত্রে আমাদের রান্নার স্টোভটা বিট্রে করেছিল। তাই ওটাকে বঙ্গোপসাগরের জলে বিসর্জন দিয়ে নতুন স্টোভ কেনা হয়েছে। অজিত সাউ তার স্যাকের ওপর পাম্প-স্টোভটা বেঁধে নিয়ে দিব্যি দ্রুতগতিতে হাঁটছে। এই অতিরিক্ত ওজন বহন করার জন্য তার কোনো আপত্তি বা রাগ নেই। হাসিমুখেই চলেছে। একেই তো বলে প্রকৃত টিম-ম্যান।

শুভব্রত, বিলু, অজিত, সৌমেনের অক্লান্ত পরিশ্রম, রান্না থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজ, আমাকে অবাক করছে। প্রাণশক্তিতে ভরপুর। বদু'র কথাও বলব। অসম্ভব মনের জোর। অভিজ্ঞতাও অনেক বেশি। সবাই মিলে যেন একটা ইউনিট।

মোটরচালিত নৌকোর ব্লেডে কাটা পড়া প্রকাণ্ড একটা সাপ সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে এল। মোটা এবং লম্বা। জেলেরা বলল বিষাক্ত সাপ। 'নাগোর' পেরিয়ে একটু বিশ্রাম।

হঠাৎ মোটরবাইক নিয়ে প্রায় ধাওয়া করার মত এক কোস্ট গার্ডের পুলিশ বালির ওপর আমাদের আটকাল।

সুতরাং থামা। সব কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখে কোস্টগার্ড বলল, কোস্টাল ট্রেকিংয়ে কি হয়?

আমি বললাম, শুধু কষ্ট হয়। আর শুধু আনন্দ হয়।

ও অবাক হয়ে বলল, হাউ ফানি! বলে চলে গেল।

দুটো নাগাদ 'কাদাইকোল' নামে একটা গ্রামের পাশে, সমুদ্রের ধারেই বসলাম। লাঞ্চ হবে। আশেপাশে বালির ওপর বহু নৌকো মেরামতি হচ্ছে। অজস্র জাল গুটিয়ে রাখা।

ছাতুর সরবত, খেজুর, বিস্কুটের লাঞ্চ দ্রুত শেষ হল। জল খেয়ে ফের চলা। বিকেলে পৌঁছলাম 'তরঙ্গমবাড়ি'। চমৎকার স্পট। সমুদ্রপারেই একটা বিশাল দুর্গ - ট্রানকুয়েভার ফোর্ট। ডেনমার্কের কোন অভিযাত্রী করেছিল। তার পাশেই সুদৃশ্য চার্চ। তাদের গেস্ট হাউস। দুধসাদা রঙ। মনে হবে ফাইভস্টার হোটেল। ঝাঁ-চকচকে গোটা জায়গাটা। আমরা রাত্রিবাসের জায়গা খুঁজছি। সেখানকার ফাদারের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিতে লাগলেন। কোথায় আমাদের আশ্রয় দেওয়া যায়। অবশেষে একটা মিশনারি স্কুল হস্টেলের দোতলায় আমাদের ব্যবস্থা হল। অত্যন্ত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। এককোণায় আমরা রান্না করলাম। তরঙ্গমবাড়ির তরঙ্গমালার শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

১৩-১২-১১ সকালে যথারীতি হাঁটা শুরু হল। বিদায় তরঙ্গমবাড়ি। ঘাড় ঘুরিয়ে ফোর্টটা দেখছি আর যারা করেছিলেন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাচ্ছি। এ যেন সমগ্র সুন্দরের শীর্ষে সুন্দরতমের আবাস।

আজকের তিরিশ কিলোমিটার হাঁটার উল্লেখ্য জায়গা হল কাবেরি নদী পার হতে হবে। ভেবেছিলাম অনেকটা ঘুরে গ্রামের মধ্যে দিয়ে নৌকো করে পার হব। কিন্তু যেখানে সমুদ্রে এসে কাবেরি নদীতে মিশেছে সেখানে মাত্র এক হাঁটু জল। এর কারণ সম্ভবত প্রলয়ংকর সুনামি। সুনামির ধাক্কা যে কত নদী খাঁড়ি ইত্যাদির ভূগোল পরিবর্ত্তন করেছে তার ইয়ত্তা নেই। যেখানে গ্রাম ছিল সেখানে সমুদ্র। গ্রাম সরে গেছে বহুদূরে। হয়ত

www.amaderchhuti.com

বা জলের তলায়।
কাবেরি নদী পার হয়ে পম্প
সমুদ্রের সমান্তরাল এক ভয়ঙ্কর বেগবতী খাঁড়ি। একদম পাড়সমান জল। দেখলে ভয় লাগে। নৌকোতেও যথেষ্ট ঝুঁকি আছে। ঘন্টা খানেক দাঁড়িয়ে যখন দিশেহারা তখনই এল একটা দাঁড়টানা নৌকো। দুজন দুজন করে ঐ পারে নিয়ে যাবে। যেখানে আজ রাত্রিবাস। গ্রামটা বেশ বড়। নাম থিরুমুলাইভাসাল।
অনেক ঝুঁকি নিয়ে কোনক্রমে টাল খেতে খেতে ডিঙ্গি নৌকো ঐ পারে সবাইকে পৌঁছে দিল। যাক, আজকের রাতের মত নিশ্চিন্ত। জলকাদা পেরিয়ে গ্রাম। একদফা জিজ্ঞাসাবাদ। তারপর একটা আশ্রয় মিলল।
কোনরকমে রাতটুকু কাটিয়ে পরদিন সকালে ফের সমুদ্রের বালি ছুঁয়ে হাঁটা শুরু। থুড়ুয়াই, পাসিয়ার পেরিয়ে গেছি। ইত্যবসরে দুটো খাঁড়ি পেরিয়েছি। প্রত্যেকেই এখন ক্লান্ত। সন্ধে অবধি হাঁটা। বিশ্রাম কম। একসময় পৌঁছে গেলাম আজকের টার্গেটে এম. জি. আর. থেট্টি।

থিরুমুলাইভাসালের কাছে

গাঁয়ের মানুষের সহায়তায় একটা বিশাল কম্যুনিটি সেন্টারে থাকার ব্যবস্থা হল। এই কমিউনিটি সেন্টারে স্তূপাকার জাল। নানা রকমের। একটা গোটানো জাল দেখলাম যার দাম পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। ওজন তিন টন। ট্রাকে চাপিয়ে সমুদ্রতীরে নিয়ে যেতে হয়। টানা দু কিলোমিটার লম্বা। এক কিলোমিটার ঝুল। এছাড়া আরও যে কত জাল। এরা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। আকিবা বলে একটা শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে বহুক্ষণ গল্প হল।
সে বলল এটা অরিজিনাল এম. জি. আর. থেট্টি নয়। সে জায়গাটা সুনামিতে সমুদ্রের জলে চাপা পড়ে গেছে। এটা তারপরে তৈরি হয়েছে। আপনারা যদি চান তো দেড় কিলোমিটার সমুদ্রের মধ্যে গেলে সেই পরিত্যক্ত গ্রামটা আমি দেখিয়ে আনতে পারি।
আমরা পরম উৎসাহিত হয়ে বললাম, কাল সকালে উঠে আমরা যাব। তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।
আকিবা কথা দিয়ে চলে গেল। খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা শুয়ে পড়লাম।

আকিবার সঙ্গে এম. জি. আর. থেট্টিতে

www.amaderchhuti.com

আজ ১৫-১২-১১। আজই আমরা আমাদের শেষ টার্গেট কুড্ডালুরু পৌঁছাব। উৎসাহে টগবগ করছি। সকালেই নৌকো করে সুনামি বিধ্বস্ত এম. জি. আর. থেট্টি দেখতে চললাম। সমুদ্রের মধ্যে একটা জায়গায় জল-বালি আর অজস্র নারকেল গাছ। আকিবা বলল, এটাই। একদিন মানুষের কোলাহলে এই গ্রাম মুখর থাকত। আজ কেউ নেই। কিছু নেই। সুনামিতে আমাদের গ্রামের একশ পঁচিশ জন মারা গেছে। সব শেষ হয়ে গেছে।
আকিবা চোখের জল মুছল।
ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা নৌকো করে আবার সমুদ্রপারে ফিরে এলাম। শুরু হল হাঁটা। কিছুতেই আকিবার কান্নাটা ভুলতে পারছিলাম না।
দ্রুত হাঁটার চেষ্টা করছি। আকাশে মেঘের আনাগোনা। পুড়ুকুপম্ পেরিয়ে গিয়ে বৃষ্টি। ঝমঝম শব্দে। আশ্রয় নিলাম সমুদ্রেরতীরে একটা গাছের নিচে। কিন্তু তাতেও ভিজে গেলাম। ফের চলা। জেলেরা আজ কেউ আর মাছ ধরতে যায়নি। সমুদ্রে সতর্কবার্তা জারি হয়েছে। সকালে টিফিন না করেই হাঁটা চালিয়ে যাচ্ছি। যত দ্রুত চলা যায়। ধীরে ধীরে নীল আকাশ গোটাটাই মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল। দুপুরের ছাতু, বিস্কুট, খেজুর, কিসমিস খেয়ে আর বিশ্রাম নয়। তাড়া করছে ঐ কালো হয়ে আসা মেঘ। আহিপেট্টাই, পাটোরা পেরিয়ে তখন বিকেল। ক্লান্তিতে শরীর যেন আর চলতে চাইছে না। একটা খাঁড়ি পথ আটকাল। জেলেদের কাছে খবর পেলাম খাঁড়ি পার হয়ে আর মাত্র সাত কিলোমিটার দূরে কুড্ডালুরু।
আনন্দে অজিত চিৎকার করে উঠল, ইয়া হু...।
খাঁড়ি পার হয়ে ঘন্টা দুয়েক হাঁটতেই আলোকিত জেলাশহর কুড্ডালোর ঝলমল করে উঠল।
আমরা পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম। হাতে হাত রেখে ঈশ্বরের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানালাম।
আজ কুড্ডালুরু থেকে বাসে চলে যাব পন্ডিচেরি। মাত্র বাইশ কিলোমিটার। একদিন সেখানে থেকেই চেন্নাই। তারপর বাড়ি ফেরার ট্রেন। বিলু অনেক ঝিনুক কুড়িয়েছে ওর মেয়ের জন্য। আমরা স্মৃতির ঝাঁপি ভর্তি করছি। সৌমেন ক্যামেরার রিল শেষ করছে। আহা কী আনন্দ আজ আকাশে বাতাসে।

~ তথ্য - তামিলনাড়ু কোস্টাল ট্রেক ~ ট্রেক রুট ম্যাপ ~ কোস্টাল ট্রেকের আরো ছবি ~

কথাসাহিত্যিক মানব চক্রবর্তীর প্রথম উপন্যাস দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'কুশ' আবির্ভাবেই জনপ্রিয় হয়েছিল। বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ছাড়াও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা ছোট গল্পগুলি। কয়েকটি ছোটগল্পের মঞ্চায়নও হয়েছে। তবে শুধু কলমই নয় মানবের ভালোলাগার আরেক নাম ভ্রমণ। মাঝেমধ্যেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন প্রকৃতি আর মানুষের আরও কাছাকাছি পৌঁছে যেতে। ষাট পেরনো এই যুবক এখনো রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন ট্রেকিং-এর কথায়। অনেক পাহাড়-সাগর পেরিয়ে তাঁর চরৈবতি ভারতবর্ষের নানান প্রান্তে আজও অবাধ।

ভয়ঙ্কর সুন্দরের টানে

দেবাশিস বিশ্বাস

~ কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানের আরো ছবি ~

ওপরে ওঠাটা আসলে একটা নেশা। এভারেস্টের শিখর ছুঁয়ে ফেলার পরও সেই নেশাটাই আমাদের ফের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। আবার কোথায় যাওয়া যায় এটা নিয়ে বসন্তদার সঙ্গে ভাবতে বসে দু'জনের মাথাতেই প্রথমে এল একটাই নাম - কাঞ্চনজঙ্ঘা।

এভারেস্টের উচ্চতা নির্ভুলভাবে মাপার আগে পর্যন্ত কাঞ্চনজঙ্ঘাকেই পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ বলে মনে করা হত। আদপে পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম হয়েও কাঞ্চনজঙ্ঘা তার আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। কাঞ্চনজঙ্ঘার পাঁচটি শৃঙ্গ কাং বাচেন-৭,৯০৩ মিটার, ইয়ালুং কাং বা কাঞ্চনজঙ্ঘা ওয়েস্ট-৮,৫০৫ মিটার, কাঞ্চনজঙ্ঘা মেন-৮,৫৮৬ মিটার, কাঞ্চনজঙ্ঘা সেন্ট্রাল-৮,৪৮২ মিটার আর কাঞ্চনজঙ্ঘা সাউথ-৮,৪৯৪ মিটার। পাঁচ শৃঙ্গকে তুলনা করা হয় ঈশ্বরের পাঁচ সম্পদভান্ডারের সঙ্গে - সোনা, রুপো, মণি, খাদ্যশস্য ও পবিত্র গ্রন্থ। ১৯৫৫ সালের ২৫শে মে প্রথম কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় করেন জো ব্রাউন ও জর্জ ব্যান্ড। এরপরে এতবছরে আরও বেশ কিছু অভিযাত্রী।

হ্যাঁ, সেই কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানই টানছিল আমাদের - আমাকে আর বসন্তদাকে। এভারেস্টের পর এই অভিযানেও আমার পথের সাথী তথা নেতা বসন্তদা অর্থাৎ বসন্ত সিংহ রায়।

২৯ মার্চ, মঙ্গলবার, শিলিগুড়িতে ন্যাফের (হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন) সম্বর্ধনা, সাংবাদিক বৈঠক এসব সেরে আমরা রওনা দিলাম নেপাল সীমান্তের দিকে। কাকড়ভিটা থেকে ইলাম হয়ে ফিদিমে রাত্রিবাস। আমাদের অভিযানের সঙ্গী দুই শেরপা ভাই পাসাং আর পেম্বা।

৩০ মার্চ ভোর ভোর বেরিয়ে পড়লাম সদলবলে। সকাল সাড়ে ছটায় পৌঁছলাম মেডিবুং। এখান থেকে হাঁটতে হবে। আমাদের কুক ছটফটে যুবক লীলাবতী রাই , পাসাং-পেম্বার ভাই তাসি, নরবু, আসরম শেরপা আর পোর্টাররাও সবাই হাজির। অতএব, আমাদের যাত্রা হল শুরু...।

www.amaderchhuti.com

কাঞ্চনজঙ্ঘা

প্রথমেই পথ নেমে গেছে নীচের দিকে, ৪,৪০০ ফুট উচ্চতার মেডিবুং থেকে ২,২০০ ফুট উচ্চতায় নেমে আসা কাবেলি নদীর পাশে। পথ উত্তর দিক বরাবর। দড়ির ব্রিজের সাহায্যে নদী পেরোলাম। হালকা ঢাল বেয়ে এবার একটু-একটু করে উঠে যাওয়া। চোখে পড়েছে ধাপ চাষের ছবি। আলু, ভুট্টা, গম - প্রধানত এসবই চাষ হয় এই অঞ্চলে। এরই সঙ্গে প্রচুর ফুল ফুটে আছে চারিদিকে। আর রংবেরঙের প্রজাপতি। যাত্রার শুরুতেই তৈরি হয়ে গেছে এক অনন্য ভিজ্যুয়াল। যাকে অন্য মাত্রা দিচ্ছে নানান ধরণের পাখির ডাক।

মাঝে এক পশলা বৃষ্টি। হাঁটার ফাঁকেই একটুকরো বিশ্রাম - দুপুরের খাওয়াদাওয়া সারা। আশপাশে ছোটখাট ঘরবাড়ি, দোকানপাট। আরও কিছুটা এগিয়ে আমেদিন গ্রাম। ছোট্ট, সুন্দর সাজানোগোছানো পাহাড়ি গাঁ। উচ্চতা ৩,৫৬০ ফুট। এখানেই বুংগা প্রাইমারি স্কুলে আমাদের রাত কাটানোর আয়োজন।

পরদিন সকাল সাতটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেড়িয়ে পড়ি। সঙ্গে প্যাকড লাঞ্চ। আশপাশে প্রচুর চাষের জমি। তার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলা। জিরিয়ে নেওয়ার জন্য পথের পাশে পাথরে বাঁধানো বসার জায়গা। ডানদিকে অনেক নীচে বয়ে চলেছে কাবেলি নদী। এবারে ওপরে ওঠার পালা। পৌঁছালাম দেওয়াং গ্রামে। কাবেলির বুকে এসে মিশেছে আরেকটি ছোট পাহাড়ি নদীর ধারা। দড়ির ব্রিজ পেরিয়ে ওপাড় থেকে উঠে গেছে খাড়া চড়াই। সেই চড়াই বেয়েই ওঠা। বেলা প্রায় সাড়ে বারোটায় পৌঁছলাম ধারাগাঁও। স্থানীয় একটা বাড়িতে খানিকটা জিরিয়ে নেওয়া গেল। মালকিনের কাছ থেকে কেনা সুস্বাদু দই খেয়ে ক্লান্তিও কাটলো।

তবে খুব বেশিক্ষণ বসার সময় নেই। যেকোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে। আবার নেমে পড়লাম পথে। আরও ঘন্টাখানেক পর পৌঁছলাম খেওয়াং। আজকের মতো এখানেই রাতের বিশ্রাম। আমাদের মালবাহকদের সর্দার কে বি লামার পরামর্শে প্রথম বাড়িটাতেই আশ্রয় নিলাম। পৌঁছে দেখি হাঁড়ির ওপর হাঁড়ি চড়িয়ে বুড়ি মালকিন তৈরি করছে ছাং - স্থানীয় মদ। পাহাড়ি মানুষজনের পছন্দের পানীয়।

পরদিন সকালে ফের বেড়িয়ে পড়া। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এগিয়ে চলা। বাড়ি, দোকানপাট, চাষের জমি নিয়ে জমজমাট গ্রাম। ইয়াম-ফু-দিন - আজকের গন্তব্য। এপথে এটাই শেষ বড় গ্রাম। পথে হঠাৎই চোখে পড়ল, মাচা বানিয়ে চারজনের কাঁধে ভর করে নামিয়ে আনা হচ্ছে এক ব্যক্তিকে। জানা গেল, অসুস্থ এক মানুষকে চিকিৎসার জন্য নীচে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এছাড়া আর কোনও উপায় নেই এইসব পাহাড়ি গ্রামে। অপরিসীম কষ্টকর এই পার্বত্য জীবনের কথা ভাবলে সত্যি শিউরে উঠতে হয়। ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠতে থাকি। এসব অঞ্চলে ছেত্রী, রাই প্রভৃতি উপজাতির মানুষজন বাস করেন। এঁরা অধিকাংশই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। সামান্য কিছু খ্রিষ্টানও আছেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শেরপারা থাকেন আরও ওপরে। প্রায় ৬,৬৬০ ফুট উচ্চতায়। উঠে আবার নামার পালা -প্রায় হাজার ফুট নীচে। পাহাড়ি পথে এভাবেই চড়াই-উতরাই ভেঙে এগিয়ে চলা। মাঝে দু-এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গিয়েছে। সেই পিছল পথে এগিয়ে চলা অতি সন্তর্পণে। যেদিকেই চোখ যায় বিচিত্র পাহাড়ি দৃশ্য। কোথাও তামাক চাষের জমি, কোথাও পাহাড়পথে নেমে এসেছে ঝরনা, কোথাও ফুটে রয়েছে আশ্চর্য সব ফুল, কখনও উড়ে যাচ্ছে রঙিন প্রজাপতি। মাঝে দু-একটা বাড়ি পড়েছে বটে, তবে এ পথের বেশিরভাগই জঙ্গল। সঙ্গে চড়াই-উতরাই তো আছেই। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর

উঠে এলাম একটা গিরিশিরার মাথায়। উচ্চতা ৬,৩৮০ ফুট। আশপাশে দু-একটা বাড়ি, কিছু চাষের জমি। আবার নেমে আসা। খানিকক্ষণ নদীর পাশে পাশে চলার পর ব্রিজ পেরিয়ে পৌঁছালাম ইয়াম-ফু-দিন। ইয়াম-ফু-দিনের দুটি গ্রাম। ওপরের বৌদ্ধ গ্রামে শেরপাদের বাস। এটি নীচের গ্রাম। এর উচ্চতা প্রায় ৫,২০০ ফুট। রয়েছে বেশ কিছু ঘরবাড়ি। যথেষ্ট উন্নত এই গ্রামটি। এই গ্রামেই রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা কানজারভেটিভ এরিয়া অফিস। নাম নথিভুক্ত করিয়ে নিলাম দুজনেই।

আবার এগিয়ে চলা উপরের দিকে। লক্ষ্য আপার ইয়াম-ফু-দিন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল বৌদ্ধদের ঘরবাড়ি। টাঙানো রয়েছে বর্ণময় প্রেয়ার ফ্ল্যাগ। আশপাশের ছবিই বলে দিচ্ছিল ইয়াম-ফু-দিনের ওপরের এই গ্রামটি বেশ বর্ধিষ্ণু। সোলার প্যানেল থেকে টেলিফোন - বিবিধ সুযোগ সুবিধে এখানে রয়েছে। উচ্চতা ৬,৫০০ ফুট। এখানেই ইয়াম-ফু-দিন গেস্ট হাউসে রাত্রিবাস।

পরদিন, ২ এপ্রিল, শনিবার। ফের হাঁটা শুরু জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। উত্তর-পূর্ব অভিমুখে ঢাল বরাবর এগিয়ে চলা। চোখে পড়ছে অজস্র ফুল, প্রজাপতি আর পাখি। ঢাল ছেড়ে এবার একেবারে মারাত্মক চড়াই। অল্প বিশ্রাম করে নিয়ে আবার ধীরে ধীরে খাড়াই বেয়ে উঠতে লাগলাম। প্রায় দেড় ঘন্টায় খাড়া চড়াই পেরিয়ে কিছুটা সমতল অংশে পৌঁছালাম। চারপাশে যেন ফুলের আগুন লেগেছে - উদ্ধত যত শাখার শিখরে নানান রঙের রডোডেনড্রনগুচ্ছ। থোকা থোকা গাঢ় বেগুনি রঙের ফুলে ছেয়ে রয়েছে পুরো ঢালটা। যেন অনেকটা বেগুনি রঙ কেউ ঢেলে দিয়েছে মাটিতে। ফুলগুলোর মিষ্টি গন্ধ ছেয়ে রয়েছে পাহাড়জুড়ে। আরও কত ফুল - কত রঙবেরঙঙের পাখি - হায়, প্রায় কাউকেই চিনিনা। উঠে এলাম প্রায় ১১,০০০ ফুট উচ্চতার লাসেথাং-এ। পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট জায়গা। গ্রামের চালাঘরে কাঠের উনুনের আগুনের ভাপে নিজেকে তাতিয়ে নিতে নিতে লীলার তৈরি পুরি, সবজি আর ডিমসেদ্ধ দিয়ে চমৎকার প্যাক লাঞ্চ সেরে আবার বেরিয়ে পড়া, আবার চড়াই। দুপাশে রডোডেনড্রনের জঙ্গল। পাহাড়ের মাথা থেকে আবার নামা নীচের দিকে। ৯,৪০০ ফুটে নেমে সঙ্গী হল সিম্বুয়াখোলা নদী। ওপাড়ে তোরনদিন। রাতটা আজ এখানেই কাটবে। শরীরটা ধাতস্থ করতে আরও একদিন কাটিয়ে দিলাম এখানে।

৪ এপ্রিল, সোমবার। আজ গন্তব্য, সেরাম। শুরুতেই হালকা ঢাল বেয়ে উঠে যাওয়া। মেঘলা আকাশ, মাঝেমাঝে বরফ পড়ছে। যেন শিল্পীর আঁকা ছবি, তার মধ্য দিয়েই ছবির একটা চরিত্র হয়ে এগিয়ে চলা। নীচে বয়ে চলেছে সিম্বুয়াখোলা। আস্তে আস্তে কমে আসছে গাছের সারি। পথ আরও ওপরের দিকে। সামনে শৃঙ্গের শ্রেণি - কোকথাং - তার বাঁ পাশে কাবরু। ঘন্টা চারেকে পৌঁছালাম সেরাম। উচ্চতা প্রায় ১২,০০০ ফুট। আগামী দু-দিন এখানেই থাকব।

৬ এপ্রিল, বুধবার। সকালে ব্রেকফাস্ট সারছি এমন সময় খবরটা প্রায় বজ্রপাতের মতই এল। শেরিং এসে জানাল আমাদের মেট কে বি লামা মারা গেছেন। আমাদের আগে গতকালই উনি সেরাম থেকে রামচের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁবুতেই মৃত্যু হয়। খাওয়া ফেলে উঠে পড়লাম। টেলিফোনে খবর দিলাম আমাদের এজেন্সি লোবেনকে। ওরা জানাল একটা হেলিকপ্টার আসছে, ওতেই মৃতদেহটা পাঠিয়ে দিতে। সত্যি বিশ্বাস হচ্ছিলনা কথাটা - যার সঙ্গে দু'দিন আগেই কথা বলেছি, সেই মানুষটা নেই...। ওর ভাই শেরিং আর পাসাং আগেই বেরিয়ে গেল রামচের দিকে। দুপুরে পেম্বা ফিরলে জানতে পারলাম শেরিং ওর দাদার মৃতদেহ নিয়ে হেলিকপ্টারে নীচে নেমে গেছে।

বেস ক্যাম্পের পথে

৭ তারিখ সকালে আবার বেড়িয়ে পড়লাম। গন্তব্য সেই রামচে। গতকাল প্রচুর বরফ পড়েছে। বরফে ঢাকা পথে চলতে বেশ অসুবিধাই হচ্ছে, জুতো-মোজা ভিজে পা একেবারে ঠান্ডা আর অসাড় হয়ে যাচ্ছে। বরফে পা পিছলেও যাচ্ছে মাঝে মাঝে। লাঠিতে ভর দিয়ে সাবধানে এগোচ্ছি। আশপাশে গাছ ক্রমশ আকারে ছোট আর সংখ্যায় কমে আসছে। যেন বড় বড় গাছগুলো হিমালয়ের কাছে মাথা নত করতে করতে ঝোপঝাড়ে মিশে যাচ্ছে। সাড়ে এগারোটা নাগাদ ১৪,৩০০ ফুট উঁচু রামচেতে পৌঁছালাম। এখানে রয়েছে পাথরের তৈরি একটি ঘর। আর সামনের ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডে প্রচুর তাঁবু। রয়েছেন দেশ-বিদেশের আরও অনেক অভিযাত্রী। সুদূর বিস্তৃত পথের উপরে দেখা যাচ্ছে একাধিক শৃঙ্গ। রাথোং (৬,৬৮২ মি), কোকথাং (৬,১৪৮ মি), কাবরুর পিকগুলো (৭৪১২, ৭৩৩৯, ৭৩৩৮ আর ৭৩১৮ মি)। চোখে পড়ছে ইয়ালুং গ্লেসিয়ারের রাইট ল্যাটারাল মোরেন। হিমবাহের এগিয়ে চলার পথে ফেলে রাখা পাথর-বালি-মাটির গ্রাবরেখা। আগামী দিন তিনেক থাকতে হবে এখানেই। তাই সাজিয়ে নেওয়া হল তাঁবু।

পরের তিন দিন ধরেই চলল টানা তুষারপাত। শুধুই তুষার ঝরছে। মাঝে মাঝে রোদ উঠে সেই তুষার গলিয়ে দিচ্ছে। একটুক্ষণ পরেই ফের শুরু হচ্ছে। চারপাশে জমে যাচ্ছে তুষার। আর জমে উঠছে তুষারমানব বানানোর খেলা। ১১ এপ্রিল আবার বেরিয়ে পড়া। এবার ডিপোজিট ক্যাম্পের দিকে পা বাড়ালাম। পথ প্রথমে পূর্ব দিকে গিয়েছে। তারপর ঘুরেছে উত্তর-পূর্ব দিকে। বাঁ-দিকে ঘুরেই চোখে পড়ল কাঞ্চনজঙ্ঘার বিভিন্ন শৃঙ্গ। যার টানে চলে আসা সমতল ছেড়ে, এই উঁচুনিচু পাহাড়ি জীবনে। বাঁদিকে ইয়ালুং কাং বা কাঞ্চনজঙ্ঘা ওয়েস্ট, তারপর কাঞ্চনজঙ্ঘা মেন, তার ডানদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা সেন্ট্রাল, আর তারপর কাঞ্চনজঙ্ঘা সাউথ। এরপর গিরিশিরা নীচে নেমে ফের উঠে গেছে তালুং শৃঙ্গে। তার দক্ষিণে কাবরু, তারও দক্ষিণে রাথোং, এরপর কোকথাং হয়ে নেমে গিয়েছে নীচে। এই গিরিশিরাই সিকিম আর নেপালের সীমানা নির্ধারণ করেছে। সকাল পৌনে দশটা নাগাদ পৌঁছলাম ওকথাং। ১৪,৯০০ ফুট। এখানেই পাথরের পর পাথর সাজিয়ে গড়ে উঠেছে শিবের উপাসনাস্থল। পুজো শেষে ফের হাঁটা। মনে একটাই কামনা, যাত্রায় যেন কোনও বিঘ্নও না ঘটে। এবার নেমে আসা নীচে, ইয়ালুং গ্লেসিয়ারের বুকে। বাঁদিকের ঢাল থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার ভয়। এগিয়ে চলা হিমবাহের ওপর দিয়েই। চোখে পড়ছে কোথাও গ্লেসিয়াল পুল, কোথাও গ্লেসিয়াল টেবল। আরও খানিক এগিয়ে পড়ল বেশ কিছুটা ফাঁকা জমি। এখানে অন্য দলের তাঁবু পড়েছে। আমরা পেরিয়ে চলি। দুপুর দুটো নাগাদ পৌঁছালাম ডিপোজিট ক্যাম্প। ১৫,১০০ ফুট। এখানেই তাঁবু লাগানো হল।

১৩ এপ্রিল রওনা বেসক্যাম্পের দিকে। উত্তর-পূর্বে। গ্লেসিয়ারের মধ্যে দিয়ে হাঁটা। বড়ো কষ্টকর এই পথ। বড়বড় পাথর ঢেকে রয়েছে বরফে। প্রতি পদক্ষেপেই পিছলে পড়ার ভয়। তবু এগিয়ে চলা। উঠে-নেমে, কখনও ডানদিক, কখনও বাঁদিক -এভাবেই ভারী সন্তর্পণে এগোনো। ইয়ালুং গ্লেসিয়ার বরাবর। বাঁদিকে জানু থেকে একটি গ্লেসিয়ার এসে মিশেছে ইয়ালুং-এ। আরও কিছুটা এগিয়েই উঠে গিয়েছে খাড়া রাস্তা। খাড়াই পথ ধরে উঠে অবশেষে পৌঁছনো গেল বেসক্যাম্পে। শেরপারা শুরু করে দিল তাঁবু লাগানোর কাজ। বেশ কদিনের আশ্রয় এখানেই, তাই মেম্বারদের তাঁবুর পাশাপাশি তৈরি করা হল কিচেন টেন্ট, ডায়নিং টেন্ট, টয়লেট টেন্ট। আর এসবের সঙ্গে তৈরি হল মন্দির।

বেশ ছড়ানো-ছেটানো জায়গায় এই বেসক্যাম্প। উচ্চতা প্রায় ১৭,৫০০ ফুট। এখানে দেখা মিলল প্রচুর পাখির। বেসক্যাম্পের পর, পরপর দুটো বরফের ঢাল, তারপরেই পাথরের দেওয়াল। এর উপরে রয়েছে বরফের খাড়া প্রাচীর। আর তার পিছনেই অপরূপ সেই কাঞ্চনজঙ্ঘা। তার চারটি শৃঙ্গ এখান থেকে দৃশ্যমান, শুধু আড়ালে পড়ে গিয়েছে পঞ্চম শৃঙ্গ কাংবাচেন। বেসক্যাম্পের পশ্চিম দিকে দেখা যাচ্ছে জানু বা কুম্ভকর্ণ শৃঙ্গ।

আমাদের দুজনের জন্য আলাদা আলাদা দুটি তাঁবু লাগানো হয়েছে। এখন থেকে আমাদের সঙ্গী পেম্বা, পাসাং ও তাসি। আর কুক লীলাবতী ও তাঁর সহকারী দাওয়া। বাকি শেরপাদের কাজ শেষ, তাঁরা ফিরে গেলেন দার্জিলিং।

বেসক্যাম্পে দেখি আরও চারটি দল রয়েছে। রাশিয়ান, ফ্রেঞ্চ, প্রেস্টিজ গ্রুপ আর সেভেন সামিট ট্রেক। এই সেভেন সামিট ট্রেক দলের কর্ণধার বিখ্যাত মিংমা শেরপা, যিনি ইতিমধ্যেই বিশ্বের ১৪টি আট হাজারি শৃঙ্গের ১৩টিই আরোহণ করে ফেলেছেন। বাকি আছে শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘা।

www.amaderchhuti.com

এখানে সফল হলে, তিনিই হবেন এই অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী প্রথম সাউথ এশিয়ান।

১৭ এপ্রিল। রওনা দিলাম ক্যাম্প ওয়ানের পথে। সঙ্গে পেম্বা। আজকে অবশ্য ট্রায়াল রান - আবহাওয়া আর প্রকৃতির সঙ্গে শরীরকে খাপ খাওয়ানোর - উচ্চতা আর তাপমাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। রওনা দিলাম সকাল পৌনে নটায়। পাথর-বোল্ডারের জমি পেরিয়ে খাড়া দুটি বরফের ঢাল ভেঙ্গে ওপরে ওঠা। ১৮,৪৬০ ফুট উচ্চতায় পৌঁছালাম সাড়ে এগারোটায়। আজ এই পর্যন্তই। মিনিট পনেরো ক্যাম্প ওয়ানের আগে এই বরফের ঢাকা পাথুরে দেওয়ালের গোড়ায় কাটিয়ে আবার নেমে এলাম বেসক্যাম্পে।

১৮ এপ্রিল। দিনটা শুরু হল পুজো-অর্চনার মধ্য দিয়ে। যাত্রার সাফল্য কামনা করে পুজো দিলাম আমরা। লামার ভূমিকায় অন্য দলের দুই শেরপা। অন্যান্যরাও মেতে উঠলেন এই পুজোয়। টাঙানো হল প্রেয়ার ফ্ল্যাগ। বাকি দিনটা কাটল বিশ্রামেই। ল্যাপটপে ছবি দেখে, গান শুনে। আগেই লাগানো হয়েছে সোলার প্যানেল। তা থেকেই মোবাইল বা ল্যাপটপের চার্জ দেওয়া যাচ্ছে। কিচেন আর ডাইনিং-এ আলোর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে এই বিদ্যুৎ।

২০ এপ্রিল। সকাল সাতটা চল্লিশ। বেসক্যাম্প ছেড়ে রওনা দিলাম। আকাশে তখন মেঘ-রোদের লুকোচুরি। আগের দিন প্রচুর তুষারপাত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই পথ চলায় বেশ সমস্যা হচ্ছে। কখনও গোড়ালি পর্যন্ত ডুবছে বরফে, কখনও হাঁটু। কষ্ট কিছুটা লাঘব করতে আগের যাত্রীর পায়ের ছাপে ছাপে পা মিলিয়ে হাঁটা। ধীরে ধীরে সেই পাথুরে দেওয়ালের গোড়ায় উঠে এলাম। এরপর প্রাণান্তকর চড়াই। দমবন্ধ করা আরোহণ। ফিক্সড রোপে জুমার লাগিয়ে খাড়া দেওয়ালে শরীরটাকে টেনে তোলা। এ পথেই বেলা দেড়টা নাগাদ উঠে এলাম ক্যাম্প ওয়ানে। উচ্চতা প্রায় ২০,৩০০ ফুট। এখান থেকে আশপাশটা স্পষ্ট দেখা যায়। ওই যে ইয়ালুং গ্লেসিয়ার। ইয়ালুং কাং-এর পায়ের কাছ দিয়ে বের হয়ে দুভাগ হয়েছে। তারপর ক্যাম্প ওয়ানের ডানদিক আর বাঁদিক দিয়ে নেমে গিয়েছে। ফের মিশেছে বেসক্যাম্পেরও নীচে গিয়ে। সেদিন ক্যাম্প ওয়ানেই থেকে পরদিন আবার নেমে এলাম বেসক্যাম্পে। এরপর ক-দিন বেসক্যাম্পে বিশ্রাম।

ফের বেরিয়ে পড়া ২৮ এপ্রিল। ইতিমধ্যে শেরপারা ক্যাম্প থ্রি পর্যন্ত রুট ওপেন করে ফেলেছেন। পথ চেনা হলেও গত কয়েকদিন প্রচুর তুষারপাতের জন্য পুরো পথের চেহারাটাই পাল্টে গিয়েছে। তাই পথ চলার কষ্টও বেড়ে গেল অনেক। একই দড়িতে পরপর আটকে আমরা চলেছি। সঙ্গে অন্যদলের লোকজনও রয়েছে। একেক সময় ঢাল এতটাই খাড়াই যে ওপরের লোকের পায়ের চাপে বরফ ভেঙে নীচের লোকজনের মাথায় এসে পড়ছে। পেম্বা আগেই সতর্ক করেছিল। আমরাও চেষ্টা করছিলাম তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যেতে। কিন্তু পুরো বিপদ কাটানো গেলনা। বারতিনেক তুষার ধস ভেঙ্গে পড়েছিল আমাদের ওপর। তবে বরফ নরম থাকায় তেমন কিছু হয়নি। সাতটা নাগাদ বেসক্যাম্প থেকে রওনা দিয়ে ক্যাম্প ওয়ান পৌঁছালাম সাড়ে বারোটায়। আবহাওয়া বেশ খারাপ। আজকের মত আর এগোনো নয়, ঘোষণা করল বসন্তদা।

ক্যাম্প - ২ এর উদ্দেশে

পরদিন গন্তব্য ক্যাম্প টু। সামনেই খাড়া বরফের ঢাল। ঢাল বেয়ে উঠে এলাম একটা বরফের রিজের মাথায়। এরপর বাঁদিকে পাথরের দেওয়াল বরাবর ট্র্যাভার্স করে নীচের দিকে নামা। এই জায়গাটুকু রক-ফল-জোন। বাঁদিকের দেওয়ালের ওপর থেকে যেকোনও সময় পাথর পড়ার ভয়। এরপর বরফের লম্বা ময়দান। আরও এগিয়ে সামনে পড়ল বরফের ঢাল। এতসব পেরিয়ে পৌঁছালাম ক্যাম্প টু। এখানে তাঁবু লাগানোর কাজ মোটেও সহজ নয়। প্রথমে কাটতে হল বরফের ঢাল। তারপর আলগা বরফ পা দিয়ে বিটিং করে লাগানো হল তাঁবু। দুটো তাঁবু লাগানো হল। একটা আমাদের আর অন্যটা শেরপাদের জন্য। শেরপাদের তাঁবুতেই রান্নার ব্যবস্থা। পাশের আইস ওয়াল থেকে বরফ কেটে, তা গ্যাস বার্নারে গলিয়ে তৈরি হল জীবনদায়ী জল।

www.amaderchhuti.com

ক্যাম্প টু-র উচ্চতা প্রায় ২১,০০০ ফুট। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘার চারটি শৃঙ্গ। চোখে পড়ে তালুং, কাবরু। হ্যাংগিং গ্লেসিয়ার ও আইস ফল জোন হওয়ার কারণে আশেপাশে অজস্র বরফের ভাস্কর্য। আর তার সঙ্গে রয়েছে প্রচুর বরফের ফাটল বা ক্রিভাস। যার গভীরে চোখ রাখলে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখা যায়না। যে অন্ধকারের প্রতিশব্দ, মৃত্যু। অতএব, চলাফেরা খুউব সাবধানে।

ঠিক ছিল ক্যাম্প টু থেকে উঠে যাওয়া হবে ক্যাম্প থ্রি-র দিকে। কিন্তু বাধ সাধল আবহাওয়া। আবার নীচে নেমে এলাম। গন্তব্য সেই বেসক্যাম্প। পর্বতারোহণে এই ওঠা-নামা লেগেই থাকে। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া অ্যাক্লেমাটাইজড হওয়া। বেসক্যাম্পে এসে আপাতত অনুকূল আবহাওয়ার জন্য অপেক্ষা চলল।

অবশেষে খবর মিলল, ১০ মে-র পর কাঞ্চনজঙ্ঘার উপরের দিকের আবহাওয়া কিছুটা সুবিধেজনক থাকবে। হাওয়া থাকবে কম। সেই মত ১৩ মে বেরিয়ে পড়লাম বেসক্যাম্প থেকে। সকাল সোয়া আটটা। এগিয়ে চললাম সেই একই পথে। চেনা পথ কিন্তু অচেনা বিপদ যেকোনও সময় এসে দাঁড়াতে পারে পথ রোধ করে। তাই সন্তর্পণে এগিয়ে চলা। একটানা। সোজা উঠে গেলাম ক্যাম্প ওয়ান ছাড়িয়ে ক্যাম্প টু-র দিকে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর, খিদে-তেষ্টায় অসহনীয় অবস্থা। তবু, কোন কিছুর কাছেই না হেরে পৌঁছালাম ক্যাম্প টু। তখন বিকেল চারটে।

পরদিন আবার বেরিয়ে পড়লাম। এবার লক্ষ্য ক্যাম্প থ্রি। খাড়া চড়াই বেয়ে একটু একটু করে এগোনো। বহু দিনের প্রাচীনত্ব এখানে বরফের রং করে দিয়েছে সবুজ। সেই নিরেট বরফ বেয়ে ওঠা, দড়িতে জুমার লাগিয়ে টেনে-টেনে চলা। হঠাৎই থামতে হল। পথ নেই, সামনেই এক অতলান্ত ক্রিভাস। প্রকৃতির আশ্চর্য ম্যাজিকেই এখানে আগে গড়ে উঠেছিল বরফের একটি স্বাভাবিক সেতু, যাকে বলে আইস ব্রিজ। সেই সেতু বেয়েই চলাচল হত। মুশকিল হল, প্রকৃতির খামখেয়ালীতে তা ভেঙে গেছে। এ খবর অবশ্য আগেই জানতাম। কিন্তু এখন উপায়? সহায় হল শেরপারা। পেম্বা আর তাসি-র আজই বেসক্যাম্প থেকে উপরে উঠে আসার কথা। সেসময়ই তাঁরা নিয়ে এলেন পরিত্যক্ত একটি অ্যালুমিনিয়াম ল্যাডার। আগের কোনও আরোহী দল ক্যাম্প ওয়ানের কাছে লাগিয়ে ছিল। সেই মই-কে কাজে লাগিয়েই পেরোনো হল ক্রিভাস। ধীরে ধীরে, ভারী সন্তর্পণে। ফের বরফের খাড়া দেওয়াল। ফের ক্রিভাস। একের পর এক খাড়া দেওয়াল আর ক্রিভাস পেরিয়ে বিকেল চারটে নাগাদ পৌঁছালাম ক্যাম্প থ্রি। উচ্চতা ২৩,০০০ ফুট। পরের দিনটা কাটল ক্যাম্প থ্রি-তেই। বিশ্রামে।

১৬ মে, সোমবার, রওনা দিলাম ক্যাম্প ফোরের দিকে। লাগিয়ে নিলাম অক্সিজেন মাস্ক। এরপরতো প্রয়োজন পড়বেই। প্রথমেই খাড়া বরফের ঢাল। বড়ো কষ্টকর এই যাত্রা। কোনও মতে, অতি সাবধানে, ঢালের ওপরে উঠলাম। আবার একটি ঢাল, তবে তুলনামূলক কম গ্র্যাডিয়েন্টের। সেই ঢাল পেরিয়ে পড়ল বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা। এবার সোজা ইয়ালুং কাং-এর দিকে চলা। আশপাশে বরফের বিচিত্র সব ভাস্কর্য। যেন কোন অজানা শিল্পীর অপূর্ব নির্মাণ। এ পথে সুন্দর যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে ভয়ঙ্করও। চতুর্দিকে ভয়াবহ সব ফাটল। ডানদিক-বাঁদিক ঘুরে ঘুরে এগোনো। পথ যেন ক্রমশই আরও লম্বা হচ্ছে। পা হচ্ছে ভারী। তবু এগিয়ে চলা ছাড়া এখানে আর কোনও উপায় নেই। আরও অনেকটা এগিয়ে অবশেষে ক্যাম্প ফোর। সামিট ক্যাম্প। উচ্চতা ২৫,০০০ ফুট। এখানেও বরফের ঢাল কেটে তাঁবু খাটানো হল। আপাতভাবে মনে হতেই পারে এত উচ্চতায় বরফের রাজ্যে ঠান্ডায় তীব্রতা মারাত্মক। রাতের বেলা কথাটা সত্যিও বটে। কিন্তু দিনের বেলা, সূর্যের আলো বরফে প্রতিফলিত হয়ে তাপমাত্রা অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। কখনও তা চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডেরও বেশি। এসময় তাঁবুর ভেতরে বসে থাকাও কষ্টকর। সঙ্গে বাতাসে অক্সিজেনের হার কমে যাওয়ার কষ্ট তো আছেই। অগত্যা ভরসা, বয়ে আনা অক্সিজেন সিলিন্ডার।

এখান থেকে আরও স্পষ্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা মেন। বাঁ পাশে ইয়ালুং কাং আর ডান পাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা সেন্ট্রাল। তারও ডানপাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা সাউথ।

এই কাঞ্চনজঙ্ঘা মেন ও ইয়ালুং কাং-এর মাঝের ঢাল বরাবরই উঠে গিয়েছে পথ। পৌঁছেছে মূল অভীষ্টে। কাঞ্চনজঙ্ঘায়। বলা বাহুল্য, সে পথ একেবারেই মসৃন নয়। সঙ্গে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনাও বড় অন্তরায়। প্রতীক্ষা তাই প্রহরবিহীন। অনুকূল আবহাওয়ার আর দেখা মেলে না। সকালে একরকম ওয়েদার রিপোর্ট আসে, বিকেলে দেখা যায় তার উল্টো। ইতিমধ্যেই যোগ দিয়েছেন রুশ, ফরাসী ও সেভেন সামিট ট্রেক দলের সদস্যরা।

১৮ মে। ইতিমধ্যেই ওপরের রাস্তা দেখে, রুট ওপেন করে এসেছেন শেরপারা। অবশেষে রওনা। বিকেল তখন পাঁচটা বেজে গেছে। কিছু দূর এগোতেই হঠাৎই মেঘলা হয়ে এল আকাশ। শুরু হল হাওয়া। সঙ্গে তুষারপাত। এর মধ্যেই কেটে গিয়েছে মিনিট চল্লিশেক। বিপদ বুঝে আমরা দাঁড়িয়ে পড়ি। নীচ থেকে শেরপারাও ডাকাডাকি শুরু করেছেন। অগত্যা ফিরে আসা ছাড়া উপায় নেই। সেই রাতটা ক্যাম্প ফোরেই কাটল।

১৯ মে, বৃহস্পতিবার। আরেকবার পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া হল অক্সিজেন সিলিন্ডার, মাস্ক। কেননা, এবারই চূড়ান্ত যাত্রা। একটু এদিক ওদিক হলেই নিশ্চিত মৃত্যু। বিকেল পাঁচটায় ফের বেরিয়ে পড়লাম। এবার সঙ্গী অন্য অভিযাত্রী দলের সদস্যরাও। বিকেলের রোদ তৈরি করেছে এক অভূতপূর্ব আবহ। পাহাড়ের মাথায় যেন রঙের খেলা। বাঁদিকে জানু আর ইয়ালুং কাং-এর ফাঁক দিয়ে দূরে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর পঞ্চম সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাকালু। তার ডানদিকে পৃথিবীর চতুর্থ উচ্চতম শৃঙ্গ লোৎসে। তারই পাশ দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সেই মাউন্ট এভারেস্ট। এ যেন উচ্চতার প্রতিযোগিতা। ক্রমশ এক অনবদ্য ছবি তৈরি করল সন্ধ্যার আলো। এ পথেই এগিয়ে যাওয়া। একবারের জন্য থামা মানেই বিরাট অপচয়। একবার দলছুট হওয়া মানেই মৃত্যুর কাছে পৌঁছে যাওয়া। দমবন্ধ করে তাই শুধুই হেঁটে চলা। নেমে এল সন্ধের অন্ধকার। হেড-টর্চ জ্বালিয়ে এগিয়ে চললাম। দুর্গম পথ। কিন্তু চমৎকার নিসর্গ। বুদ্ধ পূর্ণিমার পরদিন - চাঁদের আলোয় সে এক মায়াবী পরিবেশ।যেন পৃথিবীর এক অনাবিষ্কৃত রূপ। রাতভর চলল আরোহণ। ভোর চারটে নাগাদ ক্রমশ পরিষ্কার হতে লাগল আকাশ। পশ্চিম আকাশে তখন কাবরুর ছায়া। সামনে বরফ আর পাথরের ঢাল। সে পথেই এগিয়ে চলা। এরপর সূর্য উঠল। জানুর ওপর তখন কাঞ্চনজঙ্ঘার ছায়া। আর হয়তো কিছুক্ষণ। তারপরই সেই চূড়ান্ত মুহূর্ত। বহু কষ্ট করে উঠতে হল শেষ পর্যায়ে। কোনও মতে, ঘষটে ঘষটে। অবশেষে চূড়ার বর্গাকার সমতলে উঠে এলাম। ঘড়িতে তখন সকাল সাড়ে সাতটা। ২০ মে। শুক্রবার।

স্বপ্ন ছুঁয়ে - কাঞ্চনজঙ্ঘা শীর্ষে

হ্যাঁ, আরেকটা ইতিহাস রচনা হল। প্রায় বিশ্বাস হচ্ছিল না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারপাশ দেখতে লাগলাম। ওই তো, দূরে দেখা যাচ্ছে মাকালু, লোৎসে আর এভারেস্ট। গত বছরই এভারেস্টের শীর্ষ থেকে এমন করেই দেখেছিলাম কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। আজ কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া থেকে এভারেস্ট দর্শন - মনের মধ্যে অপূর্ব এক অনুভূতি। পশ্চিমে একটু নীচে যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে এমন দূরত্বে ইয়ালুং কাং। পূর্ব দিকে যেন ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে কাঞ্চনজঙ্ঘা সেন্ট্রাল। আরও পিছনে কিছুটা অস্পষ্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা সাউথ। দক্ষিণে দূরে রয়েছে কাবরু। সব মিলিয়ে, সে এক অনির্বচনীয় মুহূর্ত। শুরু হল পুজো দেওয়া আর ছবি তোলার পালা। কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষে তখন আমরা দু'জনে ছাড়াও শেরপাদের তিন ভাই - পাসাং, পেম্বা ও তাসি। এ-ও এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। একই সঙ্গে একই দিনে কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষে তিন ভাই! অতঃপর ওয়াকিটকির মাধ্যমে নীচে লীলাবতীকে জানিয়ে দেওয়া হল সাফল্যের খবর। এবার ঘরে ফেরার পালা...।

www.amader-chhuti.com

শিখর থেকে দেখা

~ কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানের আরো ছবি ~

ইনকাম ট্যাক্স অফিসার দেবাশিসের ভালোলাগা-ভালোবাসার সবটুকুই পাহাড়কে ঘিরে। ১৯৯৭ থেকে তাঁর পাহাড়চূড়ার অভিযান শুরু হয়েছিল। মাউন্ট কামেট, শিব, শিবলিঙ্গ, পানওয়ালিদর, রুবাল কাং - এই পাঁচ শিখর ছোঁয়ার পর বসন্ত সিংহ রায়ের সঙ্গে যৌথভাবে প্রথম অসামরিক বাঙালি পর্বতারোহী হিসেবে ২০১০ সালে এভারেস্ট আরোহণ। এরপর ২০১১-য় প্রথম অসামরিক ভারতীয় পর্বতারোহী হিসেবে বসন্ত সিংহ রায়ের সঙ্গে যৌথভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখর ছোঁয়ার ২০১২-র ২০ এপ্রিল অন্নপূর্ণা-১ শিখরজয়ী প্রথম অসামরিক বাঙালি।

মেঘমুলুক

সুচেতনা মুখোপাধ্যায় চক্রবর্তী

~ মহাবালেশ্বরের তথ্য ~ ‖ ~ মহাবালেশ্বরের আরো ছবি ~

মেঘ বলেছে 'যাব যাব' - তাই মন বলছে যাই মহারাষ্ট্রের অন্যতম পুণ্যতীর্থ মেঘভূমি মহাবালেশ্বরে। পাহাড়ের কোলে যেন ছোট্ট একটি মেঘালয়।

পুরাণে আছে প্রচণ্ড দুই দানব মহাবলি আর অতিবলির হাত থেকে রেহাই পেতে পূজারিরা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে বিষ্ণুর সাথে যুদ্ধে অতিবলি মারা যান। ক্রুদ্ধ হয়ে মহাবলি যুদ্ধে মত্ত হন। মহাবলিকে যুদ্ধে পরাস্ত করা সহজ নয়। তাই বিষ্ণু শরণাপন্ন হলেন মহাবলির আরাধ্য দেবতা দেবাদিদেব মহাদেবের। মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইলেন না মহাবলি। বরং ইচ্ছামরণের পথ বেছে নিলেন এই শর্তে যে তাঁর নাম যুক্ত হবে এই পুণ্যস্থানে যেখানে স্বয়ং শিব ও বিষ্ণু অধিষ্ঠান করেছেন। তথাস্তু বললেন দেবতারা। সেই থেকে এই স্থানের নাম হল মহাবালেশ্বর।

মহাবালেশ্বরের পথে

www.amaderchhuti.com

পুণে থেকে রওনা হলাম সকাল সকাল। মুম্বই-ব্যাঙ্গালোর হাইওয়ে ধরে গাড়ি চলেছে হু হু করে। কখনও লোকালয় কখনও বিস্তীর্ণ প্রান্তরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলেছে। শহুরে রাস্তাটা পাহাড়ের কোলে মিলিয়ে গেছে। একপাশে খাড়া পাহাড়। আমরা পাহাড়ের রাস্তা নিলাম। তারপর একটার পর একটা পাহাড় পেরিয়ে অবশেষে পৌঁছোলাম পঞ্চগনি। মহারাষ্ট্রে বেশ জনপ্রিয় এই হিল স্টেশন। দুপাশে স্ট্রবেরির ক্ষেত। পঞ্চগনির স্ট্রবেরি বিশ্ববিখ্যাত। অবশেষে পঞ্চগনি রোডের ওপর একটা বেশ জনবহুল জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। জায়গাটার নাম ম্যাপ্রো গার্ডেন। এখানে স্ট্রবেরি জ্যামের ফ্যাক্টরি, মার্কেট ও রেস্টুরেন্ট রয়েছে। পিজা থেকে শুরু করে আইসক্রিম কোল্ডড্রিংক্স্ সবই পাওয়া যায়। আর জ্যাম তো আছেই। বিক্রির সময় ডেমোনস্ট্রেশন দিচ্ছে ইউনিফর্ম পরা মেয়েরা। চেখে দেখবার সুযোগও পাচ্ছেন পর্যটকেরা। কিছু স্ট্রবেরি জ্যাম কিনে রওনা হওয়া গেল।

পঞ্চগনি থেকে আর কিছুটা গেলেই মহাবালেশ্বর। মহাবালেশ্বর ক্ষেত্রের দুটি অংশ -একটি হালে গড়ে ওঠা ছোট্ট শহর। অপরটি পুরোনো মহাবালেশ্বর। যার দূরত্ব শহর থেকে ছ' কিলোমিটার। গাড়ি সেদিকেই এগিয়ে চলল। মনে হল দূরের পাহাড় চূড়োগুলো সব যেন নিশ্চিন্ত মনে মেঘের রাজ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে। আস্তে আস্তে রাস্তাটাও যেন মেঘের মধ্যে ডুবে গেল। যতই এগোনো যাচ্ছে মহাবালেশ্বরের দিকে দিনের আলো ততই ফিকে হয়ে আসছে। মাঝে মধ্যে এলোমেলো রোদ্দুরের উঁকি আবার লুকিয়ে পরা, সব যেন একদিন কল্পনাতেই দেখেছিলাম।

বর্ষাতেই মহাবালেশ্বর সবথেকে সুন্দর। তাই বর্ষার শুরুতেই রওনা হয়েছি। সঙ্গে ছাতা, অল্প শীতের পোশাক। ক্রমেই মেঘ স্পর্শ করলাম আমরা। কখনও মনে হল সাদা ধোঁয়ায় চারদিক ভরে গেল। তারই মধ্যে দিয়ে গাড়ির জোরালো হেডলাইট পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। কি অসামান্য সুন্দর এই জায়গা!

মহাবালেশ্বর পৌঁছোলাম। রাস্তার দুপাশে দামি, কমদামি নানানধরনের রিসর্ট-হোটেলের ছড়াছড়ি। মহারাষ্ট্র সরকারের অতিথিশালাটি অল্প বাজেটে বেশ সাজানো গোছানো। আমাদের বুকিং ওখানেই ছিল। খানিক বিশ্রামের পর স্নান আর সুস্বাদু খাবার খেয়ে বেরিয়ে পরলাম। যাত্রার উদ্দেশ্য প্রতাপগড় ফোর্ট। মহাবালেশ্বর থেকে ২১ কিমি দূরে শিবাজি মহারাজের তৈরি এই ফোর্টের কয়েকটা সিঁড়ি উঠলেই দেখা যায় শিবাজির আমলে ব্যবহার করা কামান। ২৫০ সিঁড়ি ওপরে ভবানী মায়ের মন্দির। রয়েছে শিবাজির গুরু রামদাস পূজিত হনুমান মন্দিরও।

প্রতাপগড় দুর্গ

এই দুর্গের পাঁচিলে গায়ে রয়েছে চৌকো করে কাটা ছিদ্র। শোনা যায় শত্রুপক্ষ যখন আক্রমণ করত তখন এই ছিদ্রপথ দিয়ে ওপর থেকে তাদের গায়ে গরম তেল ঢেলে দেওয়া হত। দুর্গে সিঁড়ি প্রচুর। ওপরে ওঠার সময় তাই খানিক পরপর বসবার জায়গা আর রেস্টুরেন্ট বানানো। কখনও সখনও বৃষ্টি পরছে। আমরাও এখানে বসে একটু চা খেয়ে নিলাম। কিছুক্ষণ এই মেঘে ঢাকা দুর্গে সময় কাটিয়ে ফিরলাম মহাবালেশ্বরের পথে। ফেরবার পথে পাহাড়ি ঝরনার ধারে ছবি তোলা, কিংবা সঙ্গে কোয়েনা নদীর কুলকুল শব্দে মেতে ওঠা, এসব পেরিয়ে গেস্টহাউস পৌঁছোতে বিকেল গড়িয়ে এল। গেস্টহাউসের কাছেই সানসেট পয়েন্ট। একে বোম্বে পয়েন্টও বলে। দিনশেষের সূর্যের বিদায় আজ এখানেই। বোম্বে পয়েন্টের মত মাঙ্কি এবং এলিফেন্টস্টোন পয়েন্ট দুটি থেকেও সানসেট দেখা যায়।

পরদিন আবার সকাল সকাল তৈরি। শহর থেকে সাড়ে ১২ কিমি দূরে আর্থার সি পয়েন্ট। কোঙ্কন উপত্যকার চমৎকার নিসর্গ এখান থেকে দেখা যায়। মারাঠা যোদ্ধাদের ব্যবহার করা একটি পুরোনো রাস্তাও আমাদের ইতিহাস মনে করিয়ে দিচ্ছিল। মুনি-ঋষিদের ব্যবহার করা গুহাও রয়েছে এখানে। স্থানীয়রা মনে করেন একসময়ের হোম যজ্ঞের কারণে এখানকার মাটি ধূসর বর্ণের।

মহাবালেশ্বরের শিবমন্দিরে স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ রয়েছেন পর্বতশিলার আকারে। রয়েছেন এক পত্নী গায়ত্রী নদীর জলের আকারে। ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ম্ভু শিবমন্দিরের

কোয়না নদীর বুকে মহাবালেশ্বর

প্রতিষ্ঠা করেন দেওয়গিরির রাজা। ১৫৭৮ এ কৃষ্ণাবাজি মোরে এই মন্দিরকে আরও সুসজ্জিত করে তোলেন। আর শিবাজিমহারাজ একে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। হোমযজ্ঞে এই স্থান মুখরিত। মহাশিবরাত্রিতে এখানে বড় মেলা বসে। দোকান পসরা, আতসবাজি, গানবাজনায় জায়গাটি জমজমাট হয়ে ওঠে।

শিবমন্দিরের অনতিদূরেই পঞ্চগঙ্গা মন্দির। ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক সত্য যে মহাবালেশ্বর পাঁচটি নদীর উৎসস্থল -কৃষ্ণা, কোয়েনা, ভেন্না, সাবিত্রী এবং গায়ত্রী। জাভালিরাজ চন্দ্ররাও মোরে এই পঞ্চনদীর অবস্থানগত কারণেই পঞ্চগঙ্গা মন্দির স্থাপন করেছিলেন।

অবশেষে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতেই আমাদের ঘোরা শেষ হল। এই মেঘ-ছায়ে সজলবায়ে যেন পুরাণ, ইতিহাস, অরণ্যভূমি, পাহাড়, নদী উৎসের হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করলাম। মনে হল কোথায় যেন প্রকৃতি আর মানুষ মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।

~ মহাবালেশ্বরের তথ্য ~ || ~ মহাবালেশ্বরের আরো ছবি- নির্মাল্য চক্রবর্তী ~

ভ্রমণ সাহিত্যচর্চায় আগ্রহী সুচেতনার প্রিয় বিষয় জঙ্গল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখায় পাহাড়, নদী, পশুপাখি আর অরণ্যের আদিবাসী জীবনের পাশাপাশি উঠে এসেছে শহুরে জীবনের বিচিত্রতাও। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'অরণ্য হে'।

Rate This : - select -
Total Votes : 1
Average : 1.00

Like 13 people like this. Be the first of your friends. tell a Friend

www.amaderchhuti.com

Post Comments

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

আমাজনের জলে-জঙ্গলে

মঞ্জুশ্রী সিকদার

~ তথ্য- আমাজন রেন ফরেস্ট ‖ - আমাজনের আরো ছবি ~

দিনের বেলাতেও ছায়া ছায়া আঁধার। পায়ের নীচে ঘন গুল্মের চাদর। আকাশছোঁয়া প্রাচীন গাছগুলো একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছে নিবিড়তায়। পথ বলতে কিছু নেই। গাইড ভদ্রলোক যেভাবে নিয়ে চলেছেন, আমরাও চলেছি জঙ্গল ঠেলতে ঠেলতে। দু'হাতে গাছপালা সরিয়ে তৈরি করে নিচ্ছি পথ। অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ লাগছে। আমাজনের জঙ্গল...! সত্যি স্বপ্নপূরণ হল তাহলে এতদিনে!

২রা জুলাই ব্রাজিলের সাও পাওলো থেকে মানসে এসে পৌঁছালাম, তখনও জানিনা ঠিক কোথায় থাকা হবে। আগাম কোন হোটেল বুক করাও ছিল না। আমাদের পাঁচজনের ছোট্ট দল। দলনেতা জুরান সাহা বাদে আমরা সকলেই মহিলা। এয়ারপোর্টে আমাদের বসে থাকতে বলে জুরান খোঁজখবর করে জঙ্গলের মধ্যে থাকা যাবে এমন একটা গেস্টহাউস বুক করে ফেললেন।

এয়ারপোর্টেই এজেন্টের মারফত কথাবার্তা হয়ে যাওয়ার পর গাইড সমেত গেস্ট হাউসের গাড়ি আমাদের নিতে এল। ড্রাইভার সহ ৬ জনের বসার জায়গা। গাড়ির পেছনটা লরির মতো খোলা, ওখানে সব মালপত্র তোলা হল। গাড়ি চলেছে আর গাইড ধারাভাষ্য দিচ্ছেন - মানসে ১৮ লক্ষ লোকের বসবাস। আমাজনের জঙ্গলের বেশিরভাগটাই রয়েছে এই মানস রাজ্যেই। আমাজনের দুটো অংশ আপার আমাজন, লোয়ার আমাজন। এখানে সামসুং, ইয়াহামা ইত্যাদি অনেক বড় বড় কোম্পানির ফ্যাকট্রি আছে। ব্রাজিলের প্রথম ইউনির্ভাসিটি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে মানসেই স্থাপিত হয়। সলোমন এবং নিগ্রো এই দুটো নদী মিলে আমাজন নদীর সৃষ্টি। নিগ্রো নদীর তীরে এসে গাড়িটা দাঁড়াল -বার্জে করে গাড়ি সমেত ওপাড়ে যেতে হবে। একটুক্ষণ অপেক্ষা, তারপর গাড়ি থেকে নেমে বার্জে উঠলাম। গাড়িটাও আলাদা উঠল। বার্জটা চলতে লাগল - কী বিশাল নদী - বাংলাদেশের পদ্মা নদীকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল। এই নদীগুলোর উৎপত্তি পেরুর বরফগলা জল থেকে। অন্যপাড়ে পৌঁছে আবার গাড়িতে উঠে পড়লাম। প্রথমে বেশ বড় বড় বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম - আস্তে আস্তে ছোট গ্রাম - এইভাবে অনেকটা চলার পর গাড়ি এসে থামলো জলের ধারে - অল্প অল্প অন্ধকার হয়ে এসেছে। এখান থেকে নৌকো করে আমরা যাবো অতিথিশালায়। সরু লম্বা ধরনের নৌকো - বেশ ভয়ে ভয়েই উঠলাম - মালপত্রগুলো নৌকার মাঝিরা বয়ে এনে তুললো।

জলের মধ্যে দিয়ে চলেছি - অজানা পথে - থাকার জায়গায় পৌঁছাতেই যে এমন একটা অভিজ্ঞতা হবে ভাবতেও পারিনি - দারুণ একটা অনুভূতি হচ্ছিল। বেশ খানিকটা চলার পর তরী ঘাটে ভিড়লো। অতিথিশালার নাম পাউসাদা আমাজনিয়া - পাউসাদা অর্থ গেস্ট হাউস। সিঁড়ি দিয়ে বেশ খানিকটা উঠতে হয়। ঢুকেই ডাইনিং কাম রিশেপশন। সবাইকে ফলের রস দিয়ে স্বাগত জানালো। এরপর আমরা আমাদের নির্দিষ্ট ঘরে এলাম। পাহাড়ি পথের ঢালে পাথর বাঁধানো রাস্তা বেয়ে ধাপে ধাপে নামতে হয়। যাওয়া আসার এই পথ খুব সুন্দর। ঘরের ব্যবস্থাও বেশ ভালো, তবে মশার উপদ্রব, গরমও খুব। অবশ্য পাখা ছাড়াও এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা আছে। মোটামুটি গুছিয়ে নিয়ে ফিরে এলাম ডাইনিং হলে। রাতের খাবার খেয়ে একটু গল্প করে, আবার ফিরে এলাম ঘরে। এইটুকু আসতে আসতেই নানারকম পাখির ডাক শুনতে পেলাম।

৩রা জুলাই সকালে তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম - এবেলা আমরা যাব আমাজনের আপার পার্টে। ট্রেকিং করতে। আবার সেই নৌকো করেই চললাম জঙ্গলের উদ্দেশ্যে। খানিকটা চলার পর নৌকো থামলো - এবার হাঁটা শুরু। নৌকো থেকে নেমে ওপরে উঠতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। এত ঢালু যে পা পিছলে যাবার জোগাড়। আমাদের গাইড এবং নৌকাচালক দুজনের ওপর ভর দিয়ে উঠে পড়লাম। জঙ্গলের পথে আমরা প্রায় আড়াই ঘন্টা হেঁটেছি। কী অসাধারণ সেই অভিজ্ঞতা। বড় বড় গাছ পড়ে আছে সেগুলো ডিঙিয়ে কখনওবা ঝরা পাতার ওপর দিয়ে মসমস শব্দ করতে করতে আবার কোথাও গাছ এমনভাবে হেলে আছে মাথা নীচু করে চলতে হচ্ছে। অসমান পথ টাল সামলাতে গিয়ে কখনও এমন গাছ ধরে ফেলেছি যে হাতে কাঁটা লেগে গেছে। গাইড বারবার সাবধান করে দিচ্ছেন কাঁটা গাছ সম্বন্ধে। তবুও বেশি পথটা গাছ ধরে ধরেই এগিয়েছি - কখনও কখনও নিজেরাই পরস্পরকে সাহায্য করছি এগিয়ে চলতে। মাঝে মাঝে দেখি গাইড মাটির ওপর সুপারির খোলার মত পাতা উল্টে কী সব খুজে বেড়াচ্ছেন। একটা পাতার নীচ থেকে বেরোল একটা কালো মাকড়সা (টেরান্টুলা)। বিভিন্ন গাছ দেখিয়ে বোঝাচ্ছিলেন কোনটা কী ধরণের গাছ। একটা জায়গা দিয়ে হাঁটতে গিয়ে সবাইকে পিঁপড়ে ছেঁকে ধরলো। কামড়ের সে কী জ্বালা - কম বেশি সবারই জামা কাপড়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল পিপীলিকা বাহিনী। কামড়ানোর জ্বালা অনেকক্ষণ রইলো। তারপর আবার গাইড ভদ্রলোক একসময় পিঁপড়ের সারির ওপর হাত দিয়ে আমাদের শোঁকালেন - ভারী সুন্দর গন্ধ, ঠিক যেন কোন পারফিউমের। একটা গাছকে দেখিয়ে বললেন এটা হল ম্যাজিক ট্রি। আমরা তো কৌতুহলী হয়ে উঠলাম ব্যাপারটা কী? গাছের একটা ডাল কেটে খুব জোরে ঝাঁকালেন। আর কী আশ্চর্য ঐ ডালটার দুপাশ থেকে লম্বা লম্বা খেজুর পাতার মত পাতা বেরিয়ে এল। এই পাতা জঙ্গলের অধিবাসীরা ঘরের চাল হিসাবে

ব্যবহার করেন। ঘন জঙ্গলে ঘুরে আমরা অনেককিছু দেখলাম, শিখলাম, জানলাম - সত্যিকারের অনেক অভিজ্ঞতা হল।

বিকেলবেলা জঙ্গলের লোয়ার পার্ট-এ ঘোরা। অর্থাৎ অ্যারিউ নদীতে নৌকা ভ্রমণ। কথায় বলে জলে-জঙ্গলে - সত্যিসত্যি জলের মাঝেই বিস্তীর্ণ জঙ্গল - ভাবা যায় না। জলের ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বিশাল গাছ - শিকড় বা কান্ডের অর্দ্ধেকটা রয়েছে মাটির নীচে অথবা জলের তলায়। নৌকো করে যেতে যেতে দেখছি কত রংবেরঙের পাখি সব ঘরে ফিরছে। ছোট্ট ছোট্ট ব্রাজিলিয়ান বাঁদর, দেখলেই ভারী মজা লাগে। জলের মধ্যে আর এক আজব জীব - কুমীরের মত দেখতে কিন্তু আরও একটু ছোট - নাম কাইমন। সেই জন্তুটাকে জলের মধ্যে চেপে ধরে আমাদের গাইড নৌকায় তুললেন। একটু বেসামাল হলেই ঝাপটা মারবে। আমাদের মধ্যে দু'জন একে একে কায়দা করে ধরে কাইমনের সঙ্গে দিব্যি ছবি তুলে নিলেন। তারপর আবার ওটাকে জলে ছেড়ে দেওয়া হল। আস্তে আস্তে সূর্য ডুবে গেলো। মেঘ থাকার জন্য খুব ভালো করে সানসেট দেখা গেল না। শুধু মেঘের চারপাশে লালের আভা। অন্ধকার হয়ে আসছে - এরই মধ্যে চলছে পশুপাখী খোঁজা। গাছের ওপর পেঁচা বসে আছে। অন্ধকারে তার চোখ জ্বলছে। দুটো খুব বড় স্কারলেট ম্যাকাও একসঙ্গে বসে আছে। গাইড বললেন, এই পাখিগুলো সবসময় জোড়ায় জোড়ায় থাকে। একটা মরে গেলে আর একটা আত্মহত্যা করে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, পাখি আবার কীভাবে আত্মহত্যা করে? গাইড বললেন, সুদূর আকাশে উড়ে গিয়ে ডানা বন্ধ করে দেয় আর মাটিতে পড়ে মরে যায়। মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। সত্যি ভাবা যায় না, জীবজগতে এত ভালবাসা! এমন করে আমরাও বোধহয় ভালোবাসতে পারিনা। বিকেল ৪টে থেকে ৮টা পর্যন্ত জলে-জঙ্গলে ঘোরা হল। তাও আবার নৌকো করে। কী রোমাঞ্চকর অনুভূতি। অদ্ভুত এক ভালোলাগার রেশ সারা মন জুড়ে।

৪ঠা জুলাই ভোর ৫ টায় গাইড আমাদের নিয়ে চললেন আমাজনে সূর্যোদয় দেখতে। ছোট ছোট নদী পেরিয়ে একঘন্টা নৌকায় চলার পর গিয়ে পড়লাম ব্ল্যাক রিভার-এ। এখানেই অপেক্ষা সূর্য ওঠার। সারা আকাশে রংবেরঙের আবির ছড়িয়ে পড়ছে। অপলকে চেয়ে আছি রবির প্রতীক্ষায়। আস্তে আস্তে জলের মধ্যে দিয়ে তার আগমন, অর্দ্ধেকটা জলের ভিতর বাকীটা আকাশের গায়ে। কী অপরূপ দৃশ্য। কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে 'না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ'। ফেরার পথে সকালের আলোতে ডলফিনের লুকোচুরি খেলা -আর এক অভিজ্ঞতা। আস্তানায় ফিরে ব্রেকফাস্ট করে আবার বেরিয়ে পড়লাম জলে। জঙ্গল দেখা কী শেষ হয়! চলতে চলতে মোটা একটা গাছের সামনে নৌকো দাঁড়ালো। ২০০ বছরের পুরনো গাছ। নাম Samauma (Mother of the Amazan)। ২৫ জন লোক হাতে হাত মিলিয়ে তবে ধরতে পারবে পুরো গাছটাকে, বাপরে! যেতে যেতে দেখলাম জলের উপর একটা তিনতলা বাড়ি। ১৮৮৯ থেকে ১৮৯১ তে ইংরেজরা তৈরি করেছিল। এখানে এসে থাকতো রবার নেওয়ার জন্য। এইভাবে আরও কিছুক্ষণ জলে-জঙ্গলে ঘুরে ফিরে এলাম অতিথিশালায়। লাঞ্চ করে একটু বিশ্রাম। বিকেলে আবার বেরনো হল মাছ ধরতে। ঘন জঙ্গলে গাছগুলো জলের ওপর এমনভাবে রয়েছে আমাদের নৌকার ওপর প্রায় শুয়ে পড়তে হচ্ছে। মাছ ধরার নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে সবাই ছিপ ফেলে বসে গেলাম। গাইড এবং নৌকাচালক ছিপে চার লাগিয়ে দিচ্ছিলেন। সবাই-ই একটা দুটো করে মাছ ধরে ফেললাম। চাঁদা মাছের মত দেখতে। মাছ হাতে নিয়ে ফ্যাবল (আমাদের গাইড) অনেক কিছু বোঝালেন। তারপর আবার মাছগুলোকে জলে ছেড়ে দিলেন। মাছ ধরা শেষ করে আমরা চললাম আদিবাসী গ্রাম দেখতে। একটা বাড়িতে ঢুকে দেখলাম ফ্রিজ টিভি সবই আছে। এদের জীবনধারণের প্রধান উপজীব্য হল মাছধরা আর চাষবাস। তবে এই গ্রামটা তুলনামূলকভাবে একটু এগিয়ে আছে। কাল যাব পুরোপুরি আদিবাসী গ্রাম দেখতে। মানসের এক প্রত্যন্ত গ্রামে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গেছে। তাই সব দ্বীপেই আলোর সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে।

৫ই সকালবেলা চললাম আদিবাসী গ্রাম দেখতে। ১৪টা পরিবার -জনসংখ্যা ৪৮। একজন মহিলা এখানে প্রধান। ইনি একদিকে চিকিৎসক একদিকে শিক্ষিকা। এঁর

কথাই গ্রামের সবাই মেনে চলেন। মহিলা নিজে নানা রকম ওষুধ তৈরি করেন। ঘরে নানারকম শিকড়বাকড়, হাড়গোড় রয়েছে। সর্বক্ষণ উনুন জ্বলছে। শহরের মানুষও এখান থেকে ওষুধ নিয়ে যান। এখানকার ছেলেমেয়েরা আমাদের নাচগান করে দেখাল। সঙ্গীত এদের রক্তে - কতটুকু বাচ্চা সেও ড্রাম বাজাচ্ছে। এখানে অনেকরকমের বাদ্যযন্ত্র দেখলাম। পড়াশোনা করার জন্য আলাদা জায়গা। সবাই লেখাপড়া করে। গ্রামের প্রধান মহিলাই এদের পড়াশোনা করান। গ্রাম দেখা শেষ করে ফিরে এলাম গেস্ট হাউসে। লাঞ্চ করে মালপত্র নিয়ে দুপুর একটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। দুটোয় আবার ঘাটে পৌঁছে ফেরী পার হয়ে চললাম আমাজনের সঙ্গম দেখতে। মাছ বেচাকেনার ঘাটে এসে আমাদের গাড়ি দাঁড়ালো। ঘাটে নামার সিঁড়ি একদম ভাঙাচোরা। এখান থেকে স্পীড বোটে করে চললাম সঙ্গমস্থলে। খুব জোরে জল কাটতে কাটতে ভেসে চলেছি নদীবক্ষে। নদী নয়তো মনে হচ্ছে সমুদ্র। অনেকটা আসার পর অবাক হয়ে গেলাম জলের রঙ দেখে - একদিকে কালো জল - আর একদিকে ঘোলা হলুদ জল পাশাপাশি বয়ে চলেছে। কেউ কারো সঙ্গে মিশে যাচ্ছে না। দুটো জলের তাপের তারতম্যও হাত দিয়ে বেশ বোঝা গেল, একটা খুব বেশি ঠান্ডা আর একটা একটু উষ্ণ। গাইড বললেন, আমাজন পর্বতের বরফগলা জলে উৎপন্ন হয়ে অনেক পথ পেরিয়ে অনেক মাটি খনিজ পদার্থ নিয়ে চলে আসছে তাই এই জল ঘোলা আর ভারি। অন্যদিকে ব্ল্যাক রিভার সমতলেই বৃষ্টির জলে সৃষ্ট - তাই হালকা আর অপেক্ষাকৃত গরম।

অনেককিছু দেখলাম - হয়তো না দেখাই রইল বেশিটা - তবু এবার ফেরার পালা - দূর অরণ্য থেকে চেনা শহরের দিকে। শুধু চোখ বুজলেই নিবিড় সবুজ অরণ্যের আদিম গন্ধ -চেনা দুনিয়াটাকে অচেনা লাগে। হয়তোবা অচেনা পৃথিবীটাই একটু একটু করে রক্তে-ঘ্রাণে আপন হয়ে ওঠে। অপেক্ষা করে থাকি আবার কবে বেরিয়ে পড়ব সেই অচেনার ডাকে।

www.amaderchhuti.com

~ তথ্য- আমাজন রেন ফরেষ্ট ‖ আমাজনের আরো ছবি ~

ভারত সরকারের মহাগাণনিক দপ্তর থেকে অবসর নেওয়া মঞ্জুশ্রীর পায়ের তলায় সর্ষে। সুযোগ পেলেই বেড়িয়ে আসেন এদেশ-ওদেশ। ছয় মহাদেশের মাটিতে পা রাখার পর এখন তাঁর স্বপ্ন আন্টার্টিকা ভ্রমণ।

Rate This : - select -
Total Votes : 15
Average : 2.87

Like 7 people like this. Sign Up to see what your friends like.

tell a Friend

www.amaderchhuti.com

Post Comments

Darun
- Abu [2012-09-04]

Bah!
- sambit [2012-08-23]

Great!
- Gour [2012-08-21]

Icche roilo kakhono amazon-er jangol-er bhetor nouko kore jaoar
- Sahania [2012-07-05]

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

অন্য ভুবন

আই. ইউ. সি. এন. (International Union for Conservation of Nature)-এর ২০১১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯,০০০-এরও বেশি প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী বিপন্ন জীবগোষ্ঠীর আওতায় পড়ে। এর প্রধান কারণ মানুষ নিজেই। গত ৫০০ বছরের সভ্যতার ইতিহাস পৃথিবী থেকে মুছে দিয়েছে অন্ততঃ ৮০০ প্রজাতির জীবকুলকে। নির্বিচারে প্রাণীহত্যা, গাছকাটা, দূষণ – পৃথিবীকে ক্রমশঃ শ্মশান করে তুলছি আমরাই। তবু আজও কিছু মানুষ আছেন যাঁরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন এই বিশ্বকে আগামীর বাসযোগ্য করে তুলতে। তেমন কিছু ব্যতিক্রমী মানুষ ও তাঁদের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠুক 'অন্য ভুবন'।

সত্যি রূপকথা

একাই একশো! হ্যাঁ, ঘটনাটা সত্যিই তাই। প্রায় একটা রূপকথার গল্প – সত্যি রূপকথা। এক যে আছে যাদব পেয়াং। মানুষটা একেবারেই অন্যরকম। জঙ্গল যার ভালোবাসার নাম। স্ত্রী বিনিতা পেয়াং আর পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে আসামের জোরহাটে নিমাতি ঘাটের কাছে ব্রহ্মপুত্র নদকে ঘিরে গড়ে তুলেছেন একটা আস্ত বনাঞ্চল। নাম মুলাই রিজার্ভ। মুলাই - এই নামেই স্থানীয়দের মধ্যে জনপ্রিয় যাদব।

সালটা ১৯৭৯। ব্রহ্মপুত্র নদের বালুতীরে অরুনা চাপোরিতে একার চেষ্টাতেই ছোট একটা বনভূমি গড়েছিলেন যাদব। এর দু'বছর পর ওই বালুভূমিতে বনবিভাগের উদ্যোগে ২০০ হেক্টর অরণ্য এলাকা গড়ে তোলার কাজ শুরু হলে যোগ দেন সেই কাজে। ১৯৮৮ সালে সরকারিভাবে এই কাজের সময়সীমা শেষ হয়ে গেলেও পুরো ব্যাপারটাকে বুক দিয়ে আগলে রাখেন তিনি। তাঁর আদর-যত্ন আর সতর্ক প্রহরায় ওটা গিয়ে দাঁড়ায় ১০০০ হেক্টরে। এর পেছনেও রয়েছে বেদখলের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াইয়ের অনেক ঘাম ঝরানো উপাখ্যান।

মজার কথা এই যে, যতদিনে তাঁর এত পরিশ্রম এত সাধনার ফল পেতে শুরু করলেন, মানুষের ভালোর জন্য পৃথিবীকে অন্তত কিছুটা হলেও সবুজ করে তুলতে পেরেছেন, ততদিনে আশপাশের গাঁয়ের মানুষই তাঁকে একঘরে করেছেন।

তবে কোনো বাধাই কোনোদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি অদম্য এই মানুষটিকে। তাঁর হাতে গড়া সেই বনাঞ্চল এখন পুরোদস্তুর অরণ্য। বর্তমানে বাঁশ, গোমারি, সিমলু, টিক, আজার, খাকান, ভেলিউ, আম,জাম, কাঁঠাল গাছে ছাওয়া এই অরণ্যের বাসিন্দা ৫০টি বার্কিং ডিয়ার ও হগ ডিয়ার, হাতি, ২টি শিশু সহ ৫টি রয়াল বেঙ্গল টাইগার (বাঘ ও বাঘিনি মিলিয়ে), শেয়াল, বনমোরগ, শকুন, নানাধরণের সাপ ও সরীসৃপ, অজস্র স্থানীয় ও পরিযায়ী পাখি।

www.amaderchhuti.com

উষ্ণায়ন ও গাছ কাটার ক্ষতিকারক দিকগুলি নিয়ে সচেতন যাদব সরব হয়েছেন বাঘ বাঁচাও আন্দোলনেও।

বনভূমি গড়ে তলার পাশাপাশি চাষবাস ও ডেয়ারি শিল্পও গড়ে উঠেছে মুলাইয়ে। বর্তমানে ২০০টিরও বেশি গরু-মোষ রয়েছে। গরু-মোষের ওপর বারবার বাঘের হামলা হয়েছে, হাতিতে ঘর ভেঙ্গেছে। তবে এসব কোনোটা নিয়েই মাথা ঘামাতে রাজি নন যাদব, বরং মানুষের উৎপাতই তাঁর চিন্তার বিষয়। কারণ, জমি বেদখল আর গাছ কাটার জেরে চাপ পড়ছে অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রে, বদলে যাচ্ছে প্রাণীদের স্বভাব, খাবার খুঁজতে তারা হামলা করছে পোষা জীবজন্তুদের ওপর।

নদীর বুকে এটাই হয়ত সবচেয়ে বড় বনভূমি, মনে করছেন বনবিভাগের কর্তারাও। গাছপালা-পশুপাখির স্বর্গদ্যান মুলাই এখন পর্যটকদের কাছেও আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এমনকী ব্রিটিশ চলচিত্র নির্মাতা টম রবার্ট তাঁর একটি সিনেমার শুটিং-ও করেছেন এখানে। তবে এসব কোনোকিছুই যেন নষ্ট না করে তাঁর প্রিয় অরণ্যভূমি। অরণ্য আর তার পোষ্যদের বাঁচিয়ে রাখতে একক লড়াইয়ে বদ্ধপরিকর অরণ্যপুত্র যাদব। ২২ এপ্রিল, ২০১২ 'আর্থ ডে'তে তাঁকে 'ফরেস্ট ম্যান অব আসাম' সম্মানে ভূষিত করল জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি।

তথ্য সহায়তাঃ বিজিত দত্ত
লেখাঃ দময়ন্তী দাশগুপ্ত

Rate This : - select -
Total Votes : 1
Like 21 people like this. Sign Up to see what your friends like.
tell a Friend

'উঃ বাবারে'-র হাসপাতাল - 'অ্যানিমাল লিঙ্ক'

‘খাসা ডাক্তার উঃ বাবারে!
বসেন তিনি গাছতলে রে।
রোগ সারাতে তাঁরই কাছে দিচ্ছে হানা
গাইগোরু আর নেকড়ে ছানা,
গুবরে পোকা, কেঁচো ছাড়াও
ভালুকছানা!
সক্কলেরই অসুখ সারে
খাসা ডাক্তার উঃ বাবারে!’

(‘উঃ বাবারে’ -মূল রচনাঃ কর্নেই ইভানভিচ্ চুকোভস্কি, অনুবাদঃ হায়াৎ মামুদ)

নাঃ, ‘খাসা ডাক্তার উঃ বাবারে’-র ঠিকানা আমরা কেউই জানিনা। তবে তাঁরই মতো পশুপাখিদের ভালোবাসেন এমন কিছু মানুষ মিলে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে গড়ে তুলেছেন ওদের জন্যই আস্ত একটা হাসপাতাল - ‘অ্যানিমাল লিঙ্ক’।
উত্তরবঙ্গ বেড়াতে গেলেতো শিলিগুড়ি মাড়িয়ে আমরা সকলেই যাই, কিন্তু ক’জন জানি ‘অ্যানিমাল লিঙ্ক’-এর কথা? রাস্তার কুকুর-বেড়ালকে খেতে দেওয়া, সেবা-শুশ্রুষা করা এই ব্যাপারটা কিন্তু অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু ফুটপাথের জীবজন্তুদের জন্য নিজেরাই খেটেখুটে আস্ত একটা হাসপাতাল বানিয়ে ফেলাটা কিন্তু বেশ অভিনব। আর সত্যি সত্যি তেমন কাজটাই করে ফেলেছেন শিলিগুড়ির পশুপ্রেমী কিছু মানুষ। কুড়িয়ে পাওয়া পশুপাখিদের কথা বলতে কলকাতায় ‘আমাদের ছুটি’-র আস্তানায় হাজির হয়েছিলেন ‘অ্যানিমাল লিঙ্ক’-এর অন্যতম কর্ণধার দীপঙ্কর রায়। এই সংস্থার জন্ম থেকে পায়ে পায়ে বড় হয়ে ওঠার গল্প শুনলাম তাঁর কাছেই।

www.amaderchhuti.com

এতবড় ব্যাপারটাকে কাজে পরিণত করাটা কিন্তু মোটেও সহজ ছিলনা। তবে সত্যিকারের ইচ্ছে থাকলে উপায়তো হয়ই। যে যার সামর্থ্য মতো অর্থের জোগাড় করেছেন, কেউবা হাতের থেকে খুলে দিয়েছেন সোনার বালা - ঠিক এইভাবেই ২০০৮ সালে জন্ম হয়েছিল ‘অ্যানিমাল লিঙ্ক’-এর। প্রথমে উৎসাহী সদস্যদেরই একজনের ছোট্ট দোকানঘরে ঠাঁই হত অসুস্থ পশু-পাখির - সাধ্যমতো চিকিৎসা হত তাদের। সেইসময় সংস্থার সম্বল ছিল একটা সাইকেল, একটা স্কুটার আর একটা পশু তোলার গাড়ি। তারপর দাগাপুর বাবা লোকনাথ মিশনের পৃষ্ঠপোষকতায় তাদেরই দেওয়া জমিতে এখন গড়ে উঠেছে পশু হাসপাতালটি। তেমনভাবে বড় কোন ডোনেশন না পেলেও পশু-পাখিদের ভালোবাসেন এমনসব মানুষের অর্থ সাহায্যে এগিয়ে চলেছে প্রতিষ্ঠানটি। নিজেদের রোজকার রুটিনের মধ্যেই হাসপাতালের জন্য সময় বের করে নেন সদস্যেরা।

২০০৮ থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় হাজার দেড়েক পশু পাখির চিকিৎসা হয়েছে এখানে। ডুয়ার্সের অরণ্য কর্তৃপক্ষও নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন ‘অ্যানিমাল লিঙ্ক’-এর সঙ্গে, বিপদে-আপদে সাহায্য পাওয়ার জন্য। কেনেলে মাঝেমধ্যেই ঠাঁই পায় ভারতে আসা বিভিন্ন বিদেশি অভ্যাগতের পোষ্যেরা। শিলিগুড়ি মিউনিসিপালিটির সহায়তায় এখনো পর্যন্ত একশোরও বেশি পথকুকুরের স্টেরিলাইজেশন হয়েছে। কুকুর-বিড়াল ছাড়াও ‘অ্যানিমাল লিঙ্ক’ গরু, নানাধরনের সাপ, বাঁদর, শুয়োর, বনবেড়াল আর নানান পাখির শুশ্রুষার ঠাঁই। এদের চিকিৎসা করতে নিজের উৎসাহে নিয়মিত হাজির হন পশুচিকিৎসকও। তবে ওষুধপত্র, চিকিৎসা, খাওয়াদাওয়া, সার্জিকাল যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সবমিলিয়ে খরচের অঙ্কটা বেশ অনেকটাই। এইসবের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থাটিকে আগামীদিনে এন.জি.ও. হিসেবে গড়ে তোলার কথা ভাবা হচ্ছে, যাতে সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে সহায়তা পাওয়া যায়।

তথ্য সহায়তাঃ দীপঙ্কর রায়
লেখাঃ দময়ন্তী দাশগুপ্ত

Rate This : - select -
Total Votes : 1
Average : 1.00
Like 21 people like this. Sign Up to see what your friends like.
tell a Friend

বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে শেয়ার করতে চান কাছের মানুষদের সাথে - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। ছয় থেকে ছেষট্টি আমরা সবাই কিন্তু এই ছুটির আড্ডার বন্ধু। লেখা ডাকে বা নির্দিষ্ট ফর্মে মেল করে পাঠালেই চলবে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - amaderchhuti@gmail.com

হঠাৎ দেখা

ডঃ দেবপ্রিয় সেনগুপ্ত

|| তথ্য - পেঞ্চ অভয়ারণ্য ||

ঘড়িতে তখন সকাল সাড়ে সাতটা - জানুয়ারি মাসের শেষে শীত বেশ ভালোই পেঞ্চ অভয়ারণ্যে। গত দু দিন ধরে সকাল - বিকেলের জিপ সাফারিতে আমরা অগুনতি চিতল হরিণ আর সম্বর ছাড়াও নীলগাই, বুনো শুয়োর, লাঙ্গুর আর গোটা চারেক শেয়ালের দেখা পেয়েছি। আর অনেক পাখি - মাছরাঙা, মেছো বক, নীলকণ্ঠ, ক্রেস্টেড সার্পেন্ট ঈগল, ব্ল্যাক কোরমোরান্ট, রঙবেরঙের বী ক্যাচার, জমকালো ময়ূর। দিনের আলো এড়াতে গাছের কোটরে বসে আছে ছোট পেঁচা। শালের জঙ্গল আর মাঝে মাঝে 'ভৌতিক' সাদা গাছ। বেশ বোঝা যায় চাঁদনি রাতে এই গাছগুলো দেখলে বুকের ভিতর ঢিপঢিপ করতে শুরু করবে।

www.amaderchhuti.com

পেঞ্চ-কে এক সময় লেপার্ডের জায়গির বলা হত - যদিও ফরেস্ট গার্ডরা বলছিল বাঘের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে লেপার্ডরা ক্রমশ লুকিয়ে পড়ছে। বাঘ লেপার্ডের জাত শত্রু - আকারেও অনেক বড়। শেষ গণনা অনুযায়ী পেঞ্চ-এ এখন বাঘ আছে ৩৩টা। অভিজ্ঞদের মতে তাঁদের দেখা পাওয়া খুবই দুষ্কর - এ ব্যাপারে পেঞ্চের বিখ্যাত প্রতিবেশী বান্ধবগড় আর কানহা অনেক এগিয়ে।

এখনো অবধি যা দেখা গেছে তাতে আমরা বেশ খুশিই ছিলাম। ঘন সবুজ বনের নিস্তব্ধতা চিরে মাঝে মাঝে অচেনা পাখির ডাক, পাতা মাড়িয়ে খসখসে আওয়াজ তুলে হরিণের পালের দৌড়ে যাওয়া - এই তো অনেক। তবু যত পাওয়া যায়, ইচ্ছে আরও বেড়ে যায়! যদি সত্যি দেখা পাওয়া যেত বাঘের...

আমাদের জিপ একটা বাঁক ঘুরতেই আমরা এক দল গাউর-এর মধ্যে গিয়ে পড়লাম। আমাদের চারপাশে ঘিরে আছে ওরা, এমন সময় আশপাশ থেকে নানান আওয়াজ শুরু হল। গাছের মাথায় থাকা লাঙ্গুরদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল - বাঘ দেখতে পেলে যেমন 'কাঁক-কাঁক' করে ডাকে। বিশাল আকৃতির গাউরগুলোর মধ্যেও একটা অস্থিরতা - পিছন দিকে ফিরে ফিরে দেখছে। আমাদের ড্রাইভার ইঙ্গিতটা বুঝে গাড়ি ঘোরাল। সকলের মধ্যেই একটা চাপা উত্তেজনা - অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা। ড্রাইভার-ই প্রথম নজর করল - জঙ্গলের পথে রাজকীয় ভঙ্গিমায় হেঁটে যাচ্ছে - আমাদের থেকে একটু বাঁদিকে। বিরাটকায় একটা বাঘিনি - কমলা-হলুদের ওপর ডোরাকাটা গায়ে ঝলমল করছে রোদ্দুর - গলায় একটা রেডিওকলার (পরে জেনেছিলাম ফরেস্ট গার্ডরা ওকে 'কলারওয়ালি' নামে ডাকে)। জিপের এত কাছাকাছি ছিল যে আমি প্রথমটায় ভেবেছিলাম এদিকেই হয়তো আসছে! কিন্তু আমাদের পাত্তাই দিলনা, দিব্যি সোজা রাণীর মতো হেঁটে গিয়ে সামনের একটা গাছে নিজের মূত্র স্প্রে করে এলাকা চিহ্নিত করল। যেন বুঝিয়ে দিল এখানে ওই সর্বেসর্বা। তারপর ধীর পায়ে হেঁটে গেল 'জামনালা'-র দিকে। যতক্ষণ ও ছিল - একটা পিন পড়লেও যেন শোনা যেত। ছবি তোলার কথাও শুরুতে ভুলেই গিয়েছিলাম!

ফেরার পথ ধরলাম আমরা। মনটা আনন্দ আর উত্তেজনায় ভরে আছে - শুধু একটা আফসোস হচ্ছিল ভাল করে ক্যামেরায় ধরে রাখতে পারলাম না বলে। অন্যান্য পর্যটকরা - এমনকি অন্য জিপের ড্রাইভার, ফরেস্ট গার্ডরাও আমাদের ভাগ্যের প্রশংসা করছিল। 'পাগমার্ক' চোখে পড়েছে অনেকেরই - কিন্তু সেদিন বাঘ দেখার সৌভাগ্য আর কারোর হয়নি!

বাঘ দেখতে বান্ধবগড় আর কানহা তো অনেকেই যান, আমি বলি বরং ঘুরে আসুন পেঞ্চ থেকে। নাগপুর থেকে মাত্র ১০০ কিমি। এন.এইচ.৭-এ বাস থেকে নেমে পড়ুন খাসায় - সেখান থেকে জিপে ১২ কিমি দূরে তুরিয়া। নাগপুর থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে সরাসরিও পৌঁছাতে পারেন হাজার দেড়েক টাকায়। বেশ কয়েকটা বেসরকারি হোটেল আছে আর এম.পি. ট্যুরিজমের রিসর্ট কিপলিংস্ কোর্ট তো খুবই ভাল - অনেকটা খোলামেলা - সুন্দর সাজানো আর খাওয়াদাওয়া-ও দারুণ! তারপর সবুজ অরণ্যের বুকে চেনাঅচেনা বন্যপ্রাণের মাঝে হঠাৎ যদি বাঘের দেখা মেলে তাহলেতো কথাই নেই...।

(অনুবাদঃ রত্নদীপ দাশগুপ্ত)

পেশায় চিকিৎসক দেবপ্রিয় নেশায় ভ্রামণিক।

Rate This : - select -
Total Votes : 2
Average : 1.50

Like 12 people like this. Be the first of your friends.

tell a Friend

হাউসবোটে একদিন

অদিতি ভট্টাচার্য

দুপাশে ছবির মত গ্রাম, বৃষ্টিভেজা সবুজ সবুজ ধান ক্ষেত, ছোট ছোট শহর, কোথাও মাঠে বাচ্চারা খেলছে, কোথাওবা জলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে নারকেল গাছ, দূর থেকে ভেসে আসছে চার্চের ঘন্টাধ্বনি। হাউসবোটের কোলে বসে দুচোখভরে দেখছি প্রকৃতির এই অপরূপ চিত্রবিন্যাস।

www.amaderchhuti.com

কেরালার ব্যাক ওয়াটারের খ্যাতিতো সারা পৃথিবী জুড়েই। মালাবার উপকূলের সমান্তরালে অবস্থিত এই ব্যাক ওয়াটার দৈর্ঘে সমগ্র কেরালা রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধেক। ২০১০-এর অক্টোবর মাসে এই ব্যাক ওয়াটারে পুরো এক দিন এক রাত কাটাবার সুযোগ হয়েছিল আমার। সে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

কোভালাম থেকে এক অকাল বৃষ্টি ভেজা সকালে আমাদের যাত্রা শুরু হয় কোট্টায়াম জেলার কুমারাকোমের উদ্দেশ্যে। কেরালার ব্যাক ওয়াটার ক্রুইসগুলো সবই শুরু হয় কুমারাকোম নয় আলেপ্পি থেকে। দু'ধরণের হয় এই ভ্রমণ, একটা কয়েক ঘন্টার আর একটা পুরো চব্বিশ ঘন্টার। আমাদের ভ্রমণ সংস্থা আগে থেকে আমাদের জন্যে একটা দু' রুমের বাতানুকূল হাউসবোট বুক করে রেখেছিল। পুরো হাউসবোটে কুক আর দুজন চালক ছাড়া ছিলাম আমরা তিনজন - আমি আর মা-বাবা।

কেরালা গভর্ণমেন্টের নির্ধারিত নিয়মানুসারে হাউসবোট তিন রকম হয় - প্ল্যাটিনাম, গোল্ড, সিলভার। হাউসবোটের স্থানীয় নাম কেট্টুবাল্লাম। দু'হাজারেরও বেশি হাউসবোট এই রুটে টুরিস্ট নিয়ে চলাচল করে। ভাসমান এই বাড়িগুলোর আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সত্যিই দেখার মত। পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন রান্নাঘর, বিলাসবহুল হোটেলের সমতুল্য শোয়ারঘর, লাগোয়া বাথরুম, তিনদিক খোলা প্রশস্ত ডাইনিং রুম - যেখান থেকে এই ব্যাক ওয়াটার ভ্রমণ পুরোপুরি উপভোগ করা যায়। একদিন আগেই ফোন করে জেনে নেওয়া হয়েছিল আমরা কি ধরণের খাবার পছন্দ করব,আমিষ না নিরামিষ।

ওঠার সঙ্গেসঙ্গেই ওয়েলকাম ড্রিংক হিসেবে এল সরবত। মৃদুমন্দ গতিতে চলতে শুরু করল হাউসবোট। বৃষ্টিও ততক্ষণে ধরে গেছে। উন্মুক্ত ডেকে বসে দৃশ্য উপভোগ করতে ভারি ভালোলাগছে। অচেনা গ্রাম-শহর, মাঠ-ধানক্ষেত পেরিয়ে ভেসে চলেছি। কোথাও ছোট মন্দিরের সামনে ম্যারাপ বেঁধে কোনো পুজো হচ্ছে, কোথাওবা জলের দুপাশে শুধুই সবুজ, আবার কোথাওবা সাজানোগোছানো বিলাসবহুল রিসর্টের চেনা ছবি। হাউসবোট যত এগোচ্ছে দুধারের ছবির মত দৃশ্য বদলে বদলে যাচ্ছে। ফিস স্যাংচুয়ারির পাশ দিয়ে এগিয়ে জলের ধারে বার্ড স্যাংচুয়ারি দেখতে দেখতেই ভেসে যেতে লাগলাম। দেখতে পেলাম সমুদ্রতলের থেকেও নীচুতে অবস্থিত ধানের ক্ষেত।

দেখতে দেখতেই ডেকে বসে লাঞ্চও সারা হল। ভাত, নানারকম তরকারি, পাঁপড় ভাজার সঙ্গে ছিল ব্যাক ওয়াটারের বিখ্যাত ব্ল্যাক ফিসের একটা অতুলনীয় পদ। পথেই দেখেছি চাইনিজ ফিসিং নেট দিয়ে এক বিশেষ পদ্ধতিতে মাছ ধরা। কেরালার ব্যাক ওয়াটারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানকার জল নদীর জলের থেকে বেশি নোনা কিন্তু সমুদ্রের জলের মত অতটা নয়। বিকালবেলা এসে পৌঁছলাম ভেম্বানাদ লেকে, দৈর্ঘ্যে যা ভারতের সবচেয়ে বড় লেক। এখানে একটা ব্যারেজ তৈরী করা হয়েছে যাতে আরব সাগরের নোনা জল নদীর জলের সঙ্গে মিশতে না পারে। এই সব নদীর জল

চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়। এখানে একটা রেল কাম রোড ব্রিজ রয়েছে যা কোট্টায়াম আর আলেপ্পি এই দুটো জেলাকে যুক্ত করেছে। বিকাল পাঁচটা থেকে সকাল ন'টা পর্য্যন্ত কোনো হাউসবোট চলাচল করে না, এই সময়টা মাছ ধরা হয়। বেশিরভাগ হাউসবোট তাই ভেম্বানাদ লেকে রাত কাটায়।

আমাদের হাউসবোটও লেকেরই পাশে একটা গ্রামের ধারে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাউসবোট থেকে নেমে গ্রামে ঘুরতে বেরোলাম। মাটির দেওয়াল আর খড়ে ছাওয়া ছোট ছোট বাড়ি, সবুজ ধান ক্ষেত আর তার মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে মেঠো রাস্তা। সন্ধে হতেই আবার হাউসবোটে ফিরে আসা। কাছে দূরে আরও কয়েকটা হাউসবোট ততক্ষনে জড়ো হয়েছে ভেম্বানাদ লেকে। দেখতে দেখতে সব কটাতে জ্বলে উঠল হালকা আলো। চতুর্দিক অন্ধকার, শুধু হাউসবোটে জ্বলা বিন্দু বিন্দু আলো, ঝিঁঝিঁর একটানা আওয়াজ, কত নাম না জানা নিশাচর পাখির ডাক - সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত পরিবেশ। আমরা ডেকেই বসে রইলাম তা উপভোগ করার জন্যে। দূরে একটা অপেক্ষাকৃত বড় হাউসবোট থেকে ভেসে আসছিল অন্তাক্ষরী খেলার আওয়াজ। এমন রোমাঞ্চময় পরিবেশে আলো আঁধারিতে জলের ওপর খোলা ডেকে ডিনার করার অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল ঝলমলে রোদ্দুরে। আগের দিন যেটুকু মেঘ ছিল তাও যেন কোন মন্ত্রবলে উধাও। ঝকঝকে নীল আকাশ, জলে রোদের ঝিকিমিকি, মাছরাঙার উড়ে যাওয়া, হাঁসের পালের ভেসে যাওয়া - হ্যাণ্ডিক্যাম সুইচ অফ করতেই ইচ্ছে করছিল না। দোসা আর আলুর তরকারি দিয়ে প্রাতরাশ সারার পর হাউসবোট আবার চলতে শুরু করল। ঘন্টা দুয়েক চলার পর আবার কুমারাকোমে এসে থামা। হাউসবোট থেকে নেমে রওনা দিলাম থেক্কাডির দিকে। মনের মধ্যে রয়ে গেল জলপথে ভ্রমণের এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা আর হাউসবোটের ক্রু-এর অতুলনীয় আতিথেয়তা।

সংখ্যাতত্ত্ববিদ অদিতির কাছে বই আর অক্সিজেন সমতুল্য। কর্মসূত্রে বছর খানেক আরব দুনিয়ায় বসবাসের অভিজ্ঞতাও আছে। ভ্রমণ, ছবি তোলা, এম্ব্রয়ডারির পাশাপাশি লেখালেখিতেও সমান উৎসাহী।

www.amaderchhuti.com

Rate This : - select -

Like 12 people like this. Be the first of your friends.
tell a Friend

Total Votes : 2
Average : 1.50

Post Comments

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.